আখতারুজ্জামান আজাদের

বাংলা ক্লাস

আখতারুজ্জামান আজাদের

বাংলা ক্লাস

আখতারুজ্জামান আজাদের বাংলা ক্লাস
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২

প্রকাশক
আখতারুজ্জামান আজাদ

মুঠোফোন: +৮৮ ০১৮৪২ ৩৭৬ ৭৮১
ই-মেইল: akhtaruzzamanazad.law@gmail.com

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস : এনাম রেজা

ই-বুকটি পড়ে লেখককে অতিরিক্ত সম্মানী পাঠাতে চাইলে
নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলোয় পাঠানো যাবে :

বিকাশ, নগদ, উপায় : ০১৮৪২৩৭৬৭৮১
রকেট : ০১৮৪২৩৭৬৭৮১১

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
Akhtaruzzaman Azad
Account Number : 105.151.0056781
Foreign Exchange Branch
Dutch-Bangla Bank Ltd
Motijheel, Dhaka

Routing Number : 090274309
SWIFT Code : DBBLBDDH
Phone Number : +8801842376781

উৎসর্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের
অগ্রজ রিমি নাহরিন ও
অনুজ খালিদ সাব্বিরকে

মুখবন্ধ

'আখতারুজ্জামান আজাদের বাংলা ক্লাস' প্রচলিত অর্থে কোনো ব্যাকরণবই নয়। একে রেফারেন্স বই হিশেবেও ব্যবহারের সুযোগ নেই। ২০১১ সালে ফেসবুকে 'আখতারুজ্জামান আজাদের বাংলা ক্লাস' নামে একটা পেজ খুলেছিলাম। লিখতে বা বলতে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে যেসব ভুল আমরা প্রায়ই করে থাকি, সেসব ভুল নিয়ে ২০১১ সাল থেকে এই পেজে পোস্ট করে আসছি। পেজে আগের মতো এখন আর সক্রিয়ও থাকা হয় না, কোথাও কারো ভুল চোখে পড়লে সে ব্যাপারেও এখন আর উৎকণ্ঠ হওয়া হয় না। বয়সের ব্যবধানে মানুষের উত্তেজনা যে কমে আসে, তা দিন-দিন উপলব্ধি করছি।

প্রায় এক যুগ ধরে পেজটা পরিচালনা করার পরে মনে হলো– এই পেজে অদ্যাবধি যা যা পোস্ট করেছি, এর একটা সংকলন থাকা উচিত। তবে, কাগজের বই আকারে ছাপার জন্য লেখা যতটা আনুষ্ঠানিক (ফর্মাল) হতে হয়; এই পেজের পোস্টগুলো সে রকম না। তা ছাড়া, স্মার্টফোন আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে কাগজের বই পড়ার অভ্যাসও অনেকের নেই। এই পেজের পোস্টগুলো সম্পাদনা করে হার্ডকপি আকারে ছাপলে তা নিশ্চিতভাবেই বছরের পর বছর ধরে কার্টনবন্দি হয়ে ঘরে পড়ে থাকবে। যে বাসাটায় এখন থাকি, এর এক-তৃতীয়াংশজুড়েই বিভিন্ন বই পড়ে আছে বলে আর কোনো নতুন বই হার্ডকপি আকারে ছাপার সাহস পাচ্ছি না। হার্ডকপি ছাপা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষও, দেশ-বিদেশে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করাও বেশ শ্রমসাধ্য। ই-বুক এখন বিশ্বজুড়েই বেশ জনপ্রিয়। স্মার্টফোন এখন জনজীবনের নিত্য-অনুষঙ্গ বিধায় ই-বুক যখন-তখন পড়াও যায়, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেও আসে। তাই, 'আখতারুজ্জামান আজাদের বাংলা ক্লাস' শুধু ই-বুক আকারেই প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

এই ই-বুক আক্ষরিক অর্থেই সবার জন্য। শুদ্ধ করে বাংলা লিখতে চাওয়া যেকোনো ব্যক্তির জন্যই এই ই-বুক। যারা লেখক হতে চায় বা

লেখক হয়ে যাওয়ার পরও যাদের ব্যাপক বানানভুল হয় কিংবা যারা সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত আছেন, এই ই-বুক তাদের কাজে আসবে। লেখার কলাকৌশল সম্পর্কে যারা জানতে চাইবে, স্বরচিত লেখা দেখিয়ে প্রতিক্রিয়া পেতে চাইবে, পেতে চাইবে লেখক হওয়ায় ব্যাপারে টোটকা পরামর্শ; তাদের সবার জন্য এখন থেকে এই ই-বুক পড়া বাধ্যতামূলক করব।

মামলার রায় লিখতে হয় বলে এই ই-বুক বিচারকদের জন্য যেমন সহায়ক হবে, মামলা-সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র তৈরি করতে হয় বলে সহায়ক হবে পুলিশ ও আইনজীবীদের জন্যও। মোদ্দা কথা– যেসব পেশাজীবীকে দিনে, সপ্তাহে বা মাসে এক-আধ পৃষ্ঠা করে লিখতে হয়; শুদ্ধ বাংলা লিখতে ই-বুকটা তাদেরকে সহযোগিতা করবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যও এই ই-বুক সহায়ক হবে, তবে এখান থেকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার নিশ্চয়তা নেই। এই ই-বুক আত্মস্থ থাকলে যেকোনো পরীক্ষায় বিশুদ্ধভাবে বাংলা লেখা সহজতর হবে। কিন্তু এই ই-বুক কাউকে কোনো চাকরি পাইয়ে দেওয়ার বা পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না।

অর্থাৎ এই ই-বুক আত্মিক উন্নয়নের জন্য, আর্থিক উন্নয়নের জন্য না। হাতেনাতে লাভবান হওয়ার চিন্তা থাকলে 'আখতারুজ্জামান আজাদের বাংলা ক্লাস' থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো।

এই ই-বুক প্রতিবছর একবার করে হালনাগাদ করার আশা রাখি। যখন নতুন-নতুন ভুলভ্রান্তি চোখে পড়বে, তা নিয়ে পেজে পোস্ট করব; সেসব পোস্ট সম্পাদনা করে বছরান্তে একবার করে ই-বুকটি হালনাগাদ করব। অর্থাৎ এই ই-বুক সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে।

আখতারুজ্জামান আজাদ
ঢাকা, বাংলাদেশ
২ জুলাই ২০২২

আমার বানান-নীতি

আমার ব্যবহৃত বানানগুলো একটু আলাদা। অনেকেই ভাবেন আমি ভুল বানান লিখছি। কিন্তু আমি সচেতনভাবেই বানানগুলো লিখি।

'হিশেব' শব্দটা আরবি, আর 'শাদা' ফারসি। বিদেশী শব্দ বাংলায় যেভাবে উচ্চারিত হয়, বানান সেভাবেই হওয়া উচিত; ফলে উচ্চারণ অনুসারে এই শব্দ দুটোকে 'শ' দিয়ে লিখলেই ভালো দেখায়। আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আজাদ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-সহ অনেক কবি-লেখকই 'হিসেব' বা 'সাদা' না লিখে 'হিশেব' ও 'শাদা' লিখতেন বলে আমিও লিখি।

বিদেশী শব্দে ঈ-কার বা ঈ হয় না বিধায় অনেক প্রচলিত শব্দও আমি ই-কার ও ই দিয়ে লিখি, যেমন : ইদ, ইমান, নবি, নবিজি, শরিফ, শহিদ, ইসলামি, গাজি, কাজি, আলি, রাজশাহি, আওয়ামি লিগ, অ্যাকাডেমি, আলমগির, জাহাঙ্গিরনগর, পলাশি, মুরগি ইত্যাদি। দাদি, নানি, চাচি, মামি, ভাবি, রানি ইত্যাদিতেও আমি ই-কার দিই।

'হ্যাঁ' অর্থে যে 'জ্বি' বা 'জ্বী' লেখেন অনেকে, সেখানে কেবল 'জি' লেখাই যথেষ্ট। এছাড়া হজ্জ, ক্বারী, ক্বওমী, বিদ'আত ইত্যাদি বানানের পরিবর্তে হজ, কারি, কওমি, বিদাত ইত্যাদি লেখাই শ্রেয়।

ইংরেজি শব্দে অপ্রয়োজনীয় কিছু য-ফলা ব্যবহার করা হয়; ওগুলো আমার অপছন্দ বিধায় ইশু, টিশু, মেনু, ভেনু, ডেবু, বুরো, ট্রাইবুনাল ইত্যাদি লিখি। ইস্যু, টিস্যু, মেন্যু, ভেন্যুকে আমার কাছে ইসসু, টিসসু, মেন্নু, ভেন্নু মনে হয়; এর চেয়ে ইশু, টিশু, মেনু, ভেনু লিখলেই ল্যাঠা চুকে যায় এবং উচ্চারণে-বানানে সমতাও সাধিত হয়।

এমন না যে, আমি যে বানানগুলো লিখি, কেবল ওগুলোই শুদ্ধ আর অন্যগুলো অশুদ্ধ; অন্য বানানগুলো অশুদ্ধ নয় মোটেই, আমি কেবল নিজের চোখে সর্বোত্তম বানানটি ব্যবহার করি। বাংলা বানানে ব্যাপক নৈরাজ্য আছে। একই শব্দ দশ জন দশ রকমের বানানে লেখেন। এই বানাননৈরাজ্য অসহনীয়। নৈরাজ্যের ভিড়ে আমি সর্বোত্তম বানানের অন্বেষণে আছি মাত্র।

ভুল বানানের বাঁদরনাচ

বানানভুল করা এখন যেন বাঙালির সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়েছে। গণজীবনের এমন কোনো পর্যায় নেই, যেখানে বাঙালির বানানভুল দেখা যায় না। রাস্তার সাইনবোর্ড, রাষ্ট্রের সংবিধান, বিচারপতির রায়, উকিলের ওকালতনামা, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র, পত্রিকার সম্পাদকীয়, কবির কবিতা, পাঠ্যপুস্তকের পাতা, টেলিভিশনের স্ক্রল, ফেসবুকের নব্য মজিদদের মাজার থেকে শুরু করে সর্বংসহা বাংলাদেশের সর্বত্র ভুল বানানের খুলখাল্লাম খেমটা-নাচ। ইংরেজি বানানে ভুল করাকে বাঙালি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ ও লজ্জাজনক হিশেবে গণ্য করে, অপরপক্ষে বাংলা বানানে ভুল করা যেন সংসারেরই একটি অংশ। 'আমি বাংলা খুব-একটা পারি না' বলতে পারাটাকে কতিপয় মূর্খ গৌরব বলেই মনে করে। এদের ওপর থেকে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের রেশ কাটেনি এখনও, তাই মাতৃভাষার অপমান এদের কাছে দুধভাত।

ব্যক্তিত্ববিহীন অনেক ব্যক্তিরই দাবি– নামের বানানে ভুল নেই; অথচ নাম বিভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডারেরই অংশ এবং প্রতিটি শব্দেরই একটি করে শুদ্ধ বানান আছে। ভুল বানানে নাম লিখে 'নামের বানানে ভুল নেই' বলে ঐ ভুলকে বৈধতা দেওয়ার প্রয়াস নিজের নিরেট মূর্খতাকে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। অনেকে নামের ভুল বানানের ভার চাপিয়ে দেন মাধ্যমিক পরীক্ষার নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের ওপর। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না– নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী নিজ নাম শুদ্ধ করে লেখার জন্য যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিক্ষক ভুল বানানে নাম নিবন্ধন করতে চাইলে এর প্রতিবাদ করাও ঐ শিক্ষার্থীর দায়িত্ব। নাম ভুল বানানে নিবন্ধিত হয়ে গেলে অ্যাফিডেভিট করে তা পালটানোরও সুযোগ আছে। যাবজ্জীবন ভুল বানানের নাম বয়ে বেড়ানোর মতো গ্লানি আর কী বা হতে পারে!

খোদ বাংলা অ্যাকাডেমি পদকপ্রাপ্ত অনেক লেখককে চিনি, চিনি বাংলা অ্যাকাডেমির কতিপয় কর্তাব্যক্তিকে, চিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বাংলা

শিক্ষককে– যারা শুদ্ধ বানানে একটি বাংলা বাক্য লিখতে পারেন না। যে বাংলা অ্যাকাডেমি বাংলা ভাষার অভিভাবক, সেই বাংলা অ্যাকাডেমিই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ অভিন্ন বানানের একটি অভিধান তৈরি করতে। বাংলা অ্যাকাডেমির অভিধানেরই একই পৃষ্ঠায় একই শব্দ লেখা আছে একেক রকম বানানে। যে বাংলা অ্যাকাডেমি নিয়ম করেছে 'বিদেশী শব্দে ঈ- ব্যবহার করা যাবে না', সেই বাংলা অ্যাকাডেমিই দীর্ঘদিন 'অ্যাকাডেমি'কে লিখে এসেছে 'একাডেমী'; এখন তারা 'একাডেমি' লিখলেও তাদের সৃষ্ট নিয়ম-মতেই বানানটি হতে হবে 'অ্যাকাডেমি'।

অকবিদের কথা বাদই দিলাম, প্রথিতযশা অনেক কবিকেও দেখি ভুলভাল বানানে পদ্যচর্চা করতে। কবিতা শুদ্ধতার প্রতীক; কবিরা সেই শুদ্ধতার ধারক-বাহক, কবিরা শব্দের কারিগর বা ঈশ্বরও বটে। সেই কবিদের একটি কবিতায় যখন ক্ষমার অযোগ্য দেড় ডজন ভুল বানান চোখে পড়ে; তখন অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, কবিতা নামক ঐ আবর্জনাকে ছুড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে নর্দমায়। যে ব্যক্তি শব্দকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি, শেখেননি শব্দকে শুদ্ধসাজে উপস্থাপন করতে; তিনি বড়জোর শব্দের হকার, কোনোভাবেই তিনি কবি নন, উৎপন্ন শাব্দিক আবর্জনাকে কবিতা বলে অভিহিত করার অধিকারই তার নেই।

ষোলো কোটি বাঙালির হাত এখন আটচল্লিশ কোটি, বাঙালির তৃতীয় হাতটির নাম অজুহাত। যখন বিভিন্ন কবির বইয়ের বানানভুল ধরিয়ে দিই, তখন তারা দায় চাপিয়ে দেন প্রকাশক বা প্রুফরিডারের ওপর। কবি নিজেই দুটো বাক্য শুদ্ধ বানানে লিখতে না পারলে প্রকাশকের কী দায় পড়েছে বানান শুদ্ধ করার! বা প্রুফ রিডারেরই বা কী সাধ্য এত বানান ঠিক করার! প্রুফ রিডারই যদি বানান ঠিক করে দেন, তাহলে কবির কাজটা কী! যখন ফেসবুক-তারকাদের এক পোস্টে একশো ভুল ধরা পড়ে, তখন তারা দায় চাপিয়ে দেন টাচফোন বা অভ্রর ওপর; যেন লেখাগুলো তারা লেখেন না, অভ্রই লিখে দিয়ে যায়। যত দোষ, অভ্র ঘোষ!

নিজে বানান না জেনে এর ভার প্রুফরিডার বা অভ্রের ওপর চাপিয়ে

দেওয়ার মতো অমেরুদণ্ডিতা আর নেই। হাত দিয়ে লজ্জাঙ্গ ঢাকা যায়, অজুহাত দিয়ে ভুল বানানের লজ্জা ঢাকা যায় না। বাঙালি আত্মপ্রদর্শনীতে বরাবরই সাবধান। ঘরের বাইরে যাওয়ার সময়ে পোশাকনির্বাচনে-পাদুকানির্বাচনে কতই না হুঁশিয়ার, বেশভূষায় এতটুকু খুঁত থাকলেও জাত যাবে; আর ভুল বানানে লিখে লেখাটি হাজার জনতার কাছে পৌঁছাতেও তার জাত যায় না। বানানের প্রশ্নে বাঙালি এতই নির্লিপ্ত, এতই নিরুদ্বেগ!

ভুল বানান একটি দুষ্টচক্রের মতো। জীবনের সব পর্যায়ে ভুল বানান দেখি বলে বানানভুলকে আমরা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিই। কিন্তু একই শব্দ একশো জন এক হাজারভাবে লিখলে সেটি ভাষার ওপর কত বড় ধরনের নিপীড়ন, তা আমরা নিজেরাই জানি না। একই শব্দ যে যার মতো বানানে লিখলে পাঠকের মস্তিষ্কের ওপরও অসহ্য চাপ পড়ে, শুদ্ধ বানান নিয়ে বিদঘুটে বিভ্রান্তিতে পড়ে শিশুরা।

শুদ্ধ বানান একদিনে শেখা যায় না। হামদর্দের এমন কোনো সিরাপ নেই, যা এক সপ্তাহ সেবন করলে বানান শেখা হয়ে যাবে। এটি সাধনার ব্যাপার, সদিচ্ছার ব্যাপার। পরচর্চা-রূপচর্চার মতো বানানও একটি চর্চাবিশেষ। আমরা প্রতিদিন যেভাবে ত্বকের যত্ন নিই; যেদিন যে বানানগুলো নিয়ে সন্দেহ জাগে, সেদিন সেভাবে সে বানানগুলো অভিধান থেকে দেখে নিলে শেখাটা হয়ে যায়। শেখায় অগৌরব নেই, অগৌরব আছে ভুল বানানে লেখার ভেতরে। ভুল বানানে লিখলে কেউ মরে যায় না, শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় না; ক্ষতিটা হয় অদৃশ্য মেরুদণ্ডের। ভুল বানানে লিখতে-লিখতে মেরুদণ্ডটা ক্রমশ ক্ষয়ে যায়, হয়ে যেতে হয় কেঁচোর মতো অমেরুদণ্ডী।

কমিউনিকেটিভ ইংরেজি বলে এক ধরনের ভৌতিক ইংরেজি আছে, ঐ ইংরেজিতে যাচ্ছেতাই ইংরেজি লেখা যায়; কমিউনিকেটিভ বাংলা বলে কিছু নেই, শুদ্ধ বাংলাই একমাত্র বাংলা, যাচ্ছেতাই বাংলা লেখার সুযোগ নেই।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

পড়া-পরা (১)

'পরা' আর 'পড়া' এক না। কেবল পরিধান করা অর্থে 'পরা' এবং বাকি সব ক্ষেত্রে 'পড়া'। যেমন–

পরা

১. আমি পাঞ্জাবি পরি।
২. বাবা চশমা পরেন।
৩. মা শাড়ি পরেছেন।
৪. নানি চাদর পরতেন।
৫. সেদিন নীল পাঞ্জাবি পরেছিলাম, আজ লাল পাঞ্জাবি পরব।
৬. মেয়েটি নীল টিপ পরতে পছন্দ করে।
৭. কোনোমতে খেয়ে-পরে বেঁচে আছি।
৮. আমি কারোটা খাইও না, পরিও না।
৯. সেদিনের ঐ শাড়ি-পরা বালিকাটিকে আর কোথাও দেখিনি।
১০. কে গোড়ালির নিচে শাড়ি পরল, আর কে গোড়ালির ওপরে পরল; তাতে কার কী আসে-যায়! যার যেভাবে ইচ্ছে, পরুক।
১১. লাল শাড়ি পরে এসো।
১২. সে খাওয়া-পরার চিন্তায় দিশেহারা।

পড়া

১. বই পড়ছি।
২. বৃষ্টি পড়ছে।
৩. গাছ থেকে আম পড়ল।
৪. লোকটা রিকশা থেকে পড়ে গেল।
৫. বাজারে আলুর দাম পড়ে গেছে।
৬. বেজায় গরম পড়েছে।
৭. রাগ পড়ে গেছে।
৮. ভারি বিপদে পড়েছি।

পড়া-পরা (২)

‘পড়া’ ও ‘পরা’ দুটো আলাদা ক্রিয়াপদ। পরিধান করা অর্থে ‘র’ হবে, পতিত হওয়া ও পাঠ করা-সহ অন্য সকল ক্ষেত্রে ‘ড়’ হবে, যেমন :
করিম গতকাল শার্ট পরেছিল, আজ পাঞ্জাবি পরেছে, আগামীকাল ব্লেজার পরবে।

রহিম ইউনিফর্ম পরে স্কুলে পড়তে গেল, যাওয়ার পথে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেল, ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্ত পড়ল।

মেয়েটি প্রেমে পড়েছে, তাই এখন সে কামিজ না পরে শাড়ি পরে।
গরমে কেউ মোটা কাপড় পরতে চায় না।
আমি আজ পাঞ্জাবি পরেছি, কাল শার্ট পরব।

ঝুম বৃষ্টি পড়লেই তোমার কথা মনে পড়ে।
বাজারে মাছের দাম পড়ে গেছে।
বাবা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে পত্রিকা পড়তে লাগলেন। খুনখারাবির খবর সামনে পড়লেই তার চোখ থেকে পানি পড়ে।
‘কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে রাতের নির্জনে।’

কি–কী

যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দ্বারা দেওয়া যায়, সেসব প্রশ্নে 'কি' ব্যবহৃত হবে; আর যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দ্বারা দেওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে 'কী' ব্যবহৃত হবে। যেমন :

ক.

i) তুমি কি খাবে? তুমি না খেলে খাবারটা ভিখিরিকে দিয়ে দেবো।

ii) তুমি কী খাবে– ভাত না রুটি?

খ.

i) তোমার নাম কী– জামান না জামাল?

ii) তোমার বাবার নাম কি জালাল?

গ.

i) তুমি কী চাও– শার্ট না পাঞ্জাবি?

ii) তুমি কি চাও আমি তোমাকে পাঞ্জাবি কিনে দেই?

ঘ.

i) কিছু ফেলে গেলেন কি?

ii) কী ফেলে গেলেন?

ঙ.

i) দ্রব্যমূল্য যে বাড়ল, এর কি কোনো যৌক্তিক কারণ আছে?

ii) কী কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়ল?

চ.

i) তুমি কি গান গাও? না নাচো?

ii) তুমি কী গান গাও– আধুনিক গান না ব্যান্ডের গান?

বিবিধ উদাহরণ

কি :

i) তুমি কি কেবলই ছবি?

ii) তুমি কি সেই আগের মতোই আছো?

iii) সখী, ভালোবাসা কারে কয়? সে কি কেবলই যাতনাময়?

iv) আমার ছোট তরি; বলো, যাবে কি?

v) আমি যা দেখি, তুমি কি তা দ্যাখো?

কী :

i) কী করি আজ ভেবে না পাই!

ii) পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!

iii) কী গান শোনাব, ওগো বন্ধু?

iv) কী এমন দুঃখ তোমার?

v) তোমার দেওয়ার মতো কীই বা আছে আমার!

বিস্ময়সূচক বাক্যে বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াবিশেষণ হিশেবে ব্যবহৃত হলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন :

i) সে কী, দাদা! অর্ধেকটা ডিমের পুরোটাই খেয়ে ফেললেন!

ii) আহা! কী যে ভালো লাগল!

iii) সময় কী দ্রুতই না কেটে যায়!

iv) মুস্তাফিজ রোহিতকে কী নাকানিচুবানিটাই না খাওয়াল!

v) এ কী! হচ্ছেটা কী!

vi) কী ঘুমটাই না ঘুমালাম! কী শান্তি!

তবে বাক্যে অব্যয় পদ হিশেবে ব্যবহৃত হলে 'কি' লিখতে হবে। যেমন :

i) কি ব্যাটিং, কি বোলিং– সাকিব দুটোতেই বিশ্বসেরা।

ii) কি গণিত, কি ইংরেজি– দুটোতেই সে সমান পারদর্শী।

iii) দিনে কি রাতে, সাঁঝপ্রভাতে; তোমারই আছি এই তো।

এমনকি, নাকি, কিসে, বৈকি ইত্যাদি শব্দে ক-এ ই-কার বসবে।

ক্রিয়াপদের বানান

ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে অনেকেই বহুবিধ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে থাকেন। এই লেখায় চেষ্টা করব সেই দ্বন্দ্ব কিছুটা নিরসনের জন্য।

১) প্রথম দ্বিধাটা ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার ব্যবহার নিয়ে। হল না হলো, গেল না গেলো, করব না করবো, করছ না করছো, করত না করতো, হব না হবো– এই দ্বন্দ্বে পড়েন অনেকেই। সাধারণ সমাধানটা হচ্ছে ক্রিয়াপদের শেষে অযথা ও-কারের দরকার নেই। করব, করত, করছ, করছিল, করেছিল, হব ইত্যাদি ক্রিয়াপদ এসেছে যথাক্রমে করিব, করিত, করিয়াছ, করিতেছিল, করিয়াছিল ও হইব থেকে। সাধু ভাষার ঐ ক্রিয়াপদগুলোতে ও-কার নেই বলে চলিত ভাষায়ও ও-কার হবে না। তবে ও-কার না দিলে যেসব ক্রিয়াপদ বুঝতে অসুবিধে হবে, সেগুলোতে ও-কার দিতে হবে। যেমন–

'হল' বলতে hall-ও বোঝায়, তাই 'হইল'-এর চলিত রূপ 'হলো' লেখাই উত্তম; 'হত' বলতে নিহতও বোঝায়, তাই 'হইত'-এর চলিত রূপ 'হতো' লেখাই উত্তম; 'করাত' বলতে গাছ কাটার অস্ত্রবিশেষও বোঝায়, তাই 'করাইত'-এর চলিত রূপ 'করাতো' লেখাই উত্তম।

২) দ্বিতীয় দ্বিধাটা অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদে ও-কার ব্যবহার নিয়ে। যেমন : 'কর' বলতে কর্, করো, কোরো– তিনটাই বোঝায়। এর সমাধান?

ক) তুচ্ছার্থক ক্রিয়াপদের শেষে হসন্ত দেয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে। যেমন :

তুই কাজটি কর।
ঘটনাটা তুই খুলে বল।
তুই ওকে ধর।

খ) তুমি-এর বেলায় তৎক্ষণাৎ নির্দেশের ক্ষেত্রে ও-কার ব্যবহার করতে হবে। যেমন :

কাজটি এখনই করো।
ঘটনাটা খুলে বলো তো।
ধরো ওকে।

গ) তুমি-এর বেলায় ভবিষ্যৎ নির্দেশের ক্ষেত্রে দুটো ও-কার ব্যবহার করতে হবে। যেমন :

তুমি তোমার সুবিধামতো সময়ে কাজটি কোরো।
আমি বাড়ি ফেরার পর ধীরেসুস্থে ঘটনাটা বোলো।
ওকে পরে ধোরো।

৩) তৃতীয় দ্বিধাটা একটু জটিল। অনেকেই ওঠে-উঠে, তোলে-তুলে, বোঝে-বুঝে, কেনে-কিনে, মেশে-মিশে, শেখে-শিখে ইত্যাদি ক্রিয়াপদকে গুলিয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের বিবৃত রূপ (যেমন : ওঠে, তোলে, বোঝে, কেনে, মেশে, শেখে) এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সংবৃত রূপ (যেমন : উঠে, তুলে, বুঝে, কিনে, মিশে, শিখে) ব্যবহৃত হবে।

বিবৃত রূপ কী? যেটা উচ্চারণ করতে ঠোঁট বেশি মেলতে হয়, সেটা। সংবৃত রূপ কী? যেটা উচ্চারণ করতে ঠোঁট কম মেলতে হয়, সেটা। যেমন : উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঠোঁট বেশি মেলতে হয় ওঠে ও মেশে-তে, কম মেলতে হয় উঠে ও মিশে-তে। তাই ওঠে ও মেশে হচ্ছে বিবৃত রূপ এবং উঠে ও মিশে হচ্ছে সংবৃত রূপ।

সমাপিকা ক্রিয়া কী? যে ক্রিয়াপদ দ্বারা একটি বাক্য শেষ হয়। যেমন :

সে ঘুম থেকে ওঠে।
সে ফুল তোলে।
সে ভালো মানুষদের সাথে মেশে।
সে বই কেনে।
সে গান শেখে।

এখানে ওঠে-তোলে-মেশে-কেনে-শেখে দ্বারা বাক্য শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই এখানে ক্রিয়াপদের বিবৃত রূপটা ব্যবহৃত হলো।

অসমাপিকা ক্রিয়া কী? যে ক্রিয়াপদ দ্বারা একটি বাক্য শেষ হয় না, কিছু বাকি থেকে যায়। যেমন :

সে ঘুম থেকে 'উঠে' স্কুলে যায়।
সে ফুল 'তুলে' মালা গাঁথে।
সে ভালো মানুষদের সাথে 'মিশে' অনেক কিছু জেনেছে।
সে গান 'শিখে' বড় শিল্পী হবে।

এখানে উঠে-তুলে-মিশে-শিখে দ্বারা একটি বাক্যও শেষ হয়নি। তাই এরা অসমাপিকা ক্রিয়া এবং এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সংবৃত রূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুল এর, নজরুলের

ক) সমস্ত অব্যয় পদ (না, নে, রে, তো, বা, গো) বাক্যের অন্য পদ থেকে আলাদা বসবে, যেমন–

১. করি না। বলব না। যাচ্ছি না। কোরো না।
২. যাস নে। বলিস নে। যাই নে। চিনি নে।
৩. কী রে! না রে। মরে গেলাম রে! আবার আসব রে।
৪. যাচ্ছি তো। তা-ই তো। বুঝেছি তো। করব তো।
৫. হয়তো বা। কে বা মরতে চায়! কীভাবেই বা জানব! কেনই বা এসেছিলে!
৬. না গো। কী গো! কী করছ গো? ও মা গো!

খ) নি হচ্ছে সাধু রীতির নাই-এর চলিত রূপ। ক্রিয়াপদের শেষে নি আলাদাও (করি নি, খাই নি) বসতে পারে, একসাথেও (করিনি, খাইনি) বসতে পারে। তবে একসাথে বসানোই বেশি প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য।

গ) 'এর' শব্দাংশটি শব্দের সাথে মিশিয়ে লিখতে হবে, যেমন– বাংলাদেশের, নজরুলের।

অনেকেই এর-কে আলাদা লেখেন (বাংলাদেশ এর) কিংবা একটা ঊর্ধ্বকমা দিয়ে র লিখে (বাংলাদেশ'র) কাজ সারার চেষ্টা করেন। এই কাজটি কোনোভাবেই করা যাবে না। ইংরেজি অ্যাপোস্ট্রফি এস-এর (Rahim's) মতো বাংলায় অ্যাপোস্ট্রফি র-এর (রহিম'র) কোনো ব্যবস্থা নেই, বাংলায় এটা মস্ত হাস্যকর এবং অবশ্য বর্জনীয়।

"আমি নজরুল এর ভক্ত" কিংবা "আমি নজরুল'র ভক্ত"– না লিখে লিখতে হবে "আমি নজরুলের ভক্ত"।

ছাত্র দের, ছাত্রদের

কবিতা টি, কবিতা কে
কবিতা গুলো, কবিতা র, কবিতা'র
নজরুল'র
নজরুল এর
এখন ও
আমি ও
ছাত্র দের

টি, কে, গুলো, র, এর, ও, দের ইত্যাদিকে ফেসবুকে মূল শব্দ থেকে আলাদা করে লেখা হচ্ছে। যে যে-কারণেই এগুলোকে এভাবে আলাদা করে লিখুক না কেন, দেখতে ভীষণ বিশ্রী-বিদঘুটে লাগে। পদাশ্রিত নির্দেশক-গোছের বা বহুবচনসূচক শব্দাংশগুলোকে আলাদাভাবে না লিখে মূল শব্দের সাথে জোড়া দিয়ে একসাথে লিখতে হবে। উপর্যুক্ত শব্দগুলোকে লিখতে হবে কবিতাটি, কবিতাকে, কবিতাগুলো, কবিতার, নজরুলের, এখনও, আমিও, ছাত্রদের।

এর-কে আলাদাভাবে লেখার দরকার নেই। ঊর্ধ্বকমা দিয়ে র যুক্ত করে (যেমন : নজরুল'র, বাংলাদেশ'র, বিশ্ববিদ্যালয়'র) লিখলে পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়। নজরুল এর, বাংলাদেশ এর, বিশ্ববিদ্যালয় এর, নজরুল'র, বাংলাদেশ'র, বিশ্ববিদ্যালয়'র না লিখে লিখতে হবে নজরুলের, বাংলাদেশের, বিশ্ববিদ্যালয়ের। ইংরেজিতে অ্যাপোস্ট্রফি এস-এর ব্যবস্থা থাকলেও বাংলায় অ্যাপোস্ট্রফি র-এর কোনো ব্যবস্থা নেই।

যারা টি, কে, গুলো, ও, র-কে একসাথে লেখে, এরাই আবার না-কে একসাথে লেখে, যেমন : জানিনা, করিনা, বুঝিনা ইত্যাদি। অথচ না-কে আলাদা করে জানি না, করি না, বুঝি না লেখার কথা।

যেভাবে লেখার কথা, সেভাবে না লেখাটাই এবং যেভাবে না লেখার কথা, সেভাবে লেখাটাই এখন স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে!

দুর্নীতি, দূর্বা, দূরসম্পর্কের আত্মীয়

দুর্নীতি (দুঃ+নীতি)
দুর্দান্ত (দুঃ+দান্ত)
দুর্বিনীত (দুঃ+বিনীত)
দুর্বার (দুঃ+বার)
দুর্নাম (দুঃ+নাম)
দুর্মর (দুঃ+মর)
দুর্বল (দুঃ+বল)
দুর্লভ (দুঃ+লভ)
দুর্গম (দুঃ+গম)
দুর্জন (দুঃ+জন)
দুঃসহ (দুঃ+সহ)
দুরাত্মা (দুঃ+আত্মা)
দুরারোগ্য (দুঃ+আরোগ্য)
দুর্ঘটনা (দুঃ+ঘটনা)
দুর্ভাগ্য (দুঃ+ভাগ্য)

এসব শব্দে 'দু' একটি উপসর্গ মাত্র। উল্লিখিত প্রতিটি শব্দে হ্রস্ব উ-কার হবে, দীর্ঘ ঊ-কার না। 'দূর' শব্দের সাথে এই 'দু' উপসর্গের কোনো সম্পর্ক নেই। দুর্নীতি মানে দূরের নীতি নয়, খারাপ নীতি; দুর্ঘটনা মানে দূরের ঘটনা নয়, খারাপ ঘটনা; দুর্বল মানে দূরের বল নয়, শক্তিহীন। অর্থাৎ এসব শব্দে 'দু' নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, দূরত্বজ্ঞাপক অর্থে না।

উল্লেখ্য– দুর্গ, দুর্গা ও দুরবিন বানানেও হ্রস্ব উ-কার।

অপরপক্ষে 'দূর' শব্দে দীর্ঘ ঊ-কার হবে। 'দূর' শব্দ থেকে উৎপন্ন বলে দূরত্ব, দূরবর্তী, দূরদূরান্ত, দূরপাল্লা, দূরযাত্রা, দূরভাষ, দূরালাপনী, দূরীকরণ, দূরীভূত ইত্যাদি শব্দেও দীর্ঘ ঊ-কার বসবে। লতায়-পাতায় প্যাঁচানো আত্মীয় বোঝাতে অনেকে 'দুঃসম্পর্কের আত্মীয়' কথাটি

ব্যবহার করে থাকেন। আসলে কথাটি হবে 'দূরসম্পর্কের আত্মীয়'। দুর্বাসা বানানে হ্রস্ব উ-কার হলেও দূর্বাঘাসের দূর্বা বানানে দীর্ঘ ঊ-কার।

এই দুর্দৈবের দেশে দু ও দূ-সংক্রান্ত সব দুরারোগ্য বিভ্রান্তি আজই দূর হোক।

বাহুল্যদোষের দুষ্টুমি-১

লিখতে গিয়ে বা বলতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বাড়তি কিছু লিখে ফেলি বা বলে ফেলি। আপাতদৃষ্টিতে ভুলগুলোকে নিরীহ মনে হলেও দিনের শেষে ভুল ভুলই। নিরীহ ভুলগুলো বিশ্লেষণ করলে তা যে খুবই হাস্যকর লাগবে এবং অনেকে যে চমকেও উঠবেন, তা বলাই বাহুল্য। লেখা বা বলার ক্ষেত্রে এই ভুলগুলো এড়িয়ে চলতে হবে অবশ্যই।

১. 'বাংলাদেশের শতকরা নব্বই পারসেন্ট লোক গ্রামে থাকে'– এ ধরনের বাক্য অনেকেই ব্যবহার করেন এবং তারা ভুলে যান যে, শতকরা মানেই পারসেন্ট, পারসেন্ট মানেই শতকরা। অতএব বলতে হবে 'বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোক গ্রামে থাকে' অথবা 'বাংলাদেশের নব্বই পারসেন্ট লোক গ্রামে থাকে।'

২. হারানো-বিজ্ঞপ্তিতে একটি বহুল ব্যবহৃত বাক্য হচ্ছে 'কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি ছেলেটিকে খুঁজে পেলে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করুন।' আসলে 'সহৃদয়বান' শব্দে 'স' মানে যা, 'বান' মানেও তা। অতএব 'সহৃদয়বান' না লিখে 'হৃদয়বান' বা 'সহৃদয়' লিখতে হবে।

৩. মূল্য মানেই দাম, দাম মানেই মূল্য। অতএব 'দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে' বলে কপাল না চাপড়ে 'দ্রব্যের দাম বেড়ে গেছে' অথবা 'দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে' বলে কপাল চাপড়াতে হবে।

৪. কাল মানে সময়, সময় মানে কাল। অতএব 'পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ফোন রাখা যাবে না' বলে ধমক না দিয়ে 'পরীক্ষা চলাকালে ফোন রাখা যাবে না' অথবা 'পরীক্ষা চলার সময়ে ফোন রাখা যাবে না' বলে ধমক দিতে হবে।

৫. শব মানে রাত, রাত মানে শব। অতএব 'শবে বরাতের রাতে নামাজ পড়ব' বলা যাবে না। বলতে হবে 'বরাতের রাতে নামাজ পড়ব' অথবা 'শবে বরাতে নামাজ পড়ব।'

৬. দিবস মানেই দিন, দিন মানেই দিবস। অতএব 'বিজয়-দিবসের দিন স্মৃতিসৌধে যাব' না বলে বলতে হবে 'বিজয়-দিবসে স্মৃতিসৌধে যাব' অথবা 'বিজয়ের দিন স্মৃতিসৌধে যাব।' একই কারণে 'ভ্যালেন্টাইন ডের দিন সে আমাকে ফুল দিয়েছে' না বলে বলতে হবে 'ভ্যালেন্টাইন ডেতে সে আমাকে ফুল দিয়েছে' অথবা 'ভ্যালেন্টাইন-দিবসে সে আমাকে ফুল দিয়েছে।'

৭. ইভেন (even) অর্থ এমনকি। 'সে আমার গায়ে ইভেনকি হাত তুলেছে' বলে মুখ নষ্ট করা ঠিক না। বলতে হবে 'সে আমার গায়ে ইভেন হাত তুলেছে' অথবা 'সে আমার গায়ে এমনকি হাত তুলেছে।'

৮. লাশ জীবিত হয় না, মৃতই হয়। অতএব 'তোর মৃত লাশ আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব' বলে হুমকি দিয়ে লাভ নেই। হুমকি দিতে হবে 'তোর লাশ আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব' অথবা 'তোর মৃতদেহ আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব' বলে।

৯. জোক মানে কৌতুক, জোকস মানে কৌতুকগুলো। অতএব 'একটা জোকস বলো তো' বলা যাবে না। বলতে হবে 'একটা জোক বলো তো।'

১০. ফ্রেন্ডস মানেই বন্ধুরা। অতএব 'ফ্রেন্ডসরা' বলে কিছু নেই। বলতে হবে ফ্রেন্ডরা। একই কারণে সাপোর্টার্সরা, লিসেনার্সরা, ভিউয়ার্সরা, রুমমেটসরা না বলে বলতে হবে যথাক্রমে সাপোর্টাররা, লিসেনাররা, ভিউয়াররা, রুমমেটরা। 'টপিক্সগুলো' না বলে বলতে হবে 'টপিকগুলো'। প্যারেন্টস, চিলড্রেন, পিপল– এরা প্রত্যেকে এমনিতেই বহুবচন, এর কোনোটির সাথে রা, দের বা গুলো যোগ করা যাবে না।

১১. মর্নিং ওয়াক মানেই সকালের হাঁটাহাঁটি। অতএব 'তিনি প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াকে যান' না বলে বলতে হবে 'তিনি প্রতিদিন মর্নিং ওয়াকে যান' অথবা 'তিনি প্রতিদিন সকালে হাঁটতে যান।'

১২. 'নেতৃবৃন্দগণ' শব্দটি রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শোনা যায়। বৃন্দ নিজেই বহুবচন, এখানে খামোখা 'গণ' যোগ করতে হবে না। 'সকল

নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা' জানানোর দরকার নেই। 'সকল নেতাকে শুভেচ্ছা' জানালেই চলবে। 'সকল' কথাটি বললে তৎপরবর্তী শব্দটিকে আর বহুবচন বানানো যাবে না। তাই 'সব বাবাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই' না বলে বলতে হবে 'সব বাবাকে শ্রদ্ধা জানাই।' একই কারণে 'সব ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি' না লিখে লিখতে হবে 'সব ভাষাশহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

১৩. রিপিট করা মানেই আবার ঘটানো। অতএব 'কথাটা আবার রিপিট করো' না বলে বলতে হবে 'কথাটা রিপিট করো।'

১৪. 'সাবেক' মানেই 'অতীতে ছিল এমন কিছু'। অতএব 'সে আমার সাবেক প্রেমিকা ছিল' না বলে বলতে হবে 'সে আমার প্রেমিকা ছিল' অথবা 'সে আমার সাবেক প্রেমিকা।' একই কারণে 'তিনি একজন সাবেক সাংসদ ছিলেন' না বলে বলতে হবে 'তিনি একজন সাংসদ ছিলেন' অথবা 'তিনি একজন সাবেক সাংসদ।'

১৫. কনিষ্ঠ মানেই সবচেয়ে ছোট, জ্যেষ্ঠ মানেই সবচেয়ে বড়। এদের সাথে 'তম' যোগ করা যাবে না। অতএব 'আমি আমার বাবার কনিষ্ঠতম ছেলে' না বলে বলতে হবে 'আমি আমার বাবার কনিষ্ঠ ছেলে' এবং 'আমার জ্যেষ্ঠতম চাচা মারা গেছেন' না বলে বলতে হবে 'আমার জ্যেষ্ঠ চাচা মারা গেছেন।'

১৬. বেস্ট মানেই সবচেয়ে ভালো। তাই 'ও আমার সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড' না বলে বলতে হবে 'ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড' অথবা 'ও আমার সবচেয়ে ভালো ফ্রেন্ড।' আবার লেটেস্ট মানেই সর্বশেষ। অতএব 'ভাইবারের সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সনটা পাঠাও' না বলে বলতে হবে 'ভাইবারের লেটেস্ট ভার্সনটা পাঠাও' অথবা 'ভাইবারের সর্বশেষ ভার্সনটা পাঠাও।'

১৭. ভ্যাকেন্সি মানেই 'খালি'। অতএব 'ভ্যাকেন্সি খালি নেই' বলা যাবে না, 'ভ্যাকেন্সি নেই' বলতে হবে।

১৮. যেহেতু ট্রি মানেই গাছ, সেহেতু 'রেইন ট্রি' বললেই চলবে। 'রেইন ট্রি গাছ' বলার দরকার নেই।

১৯. 'ঢাকায় বাই রোডে এসেছি' বা 'কোলকাতায় অন এয়ারে যাব' বলার দরকার নেই। বলতে হবে 'ঢাকায় বাই রোড এসেছি' এবং 'কোলকাতায় অন এয়ার যাব'।

২০. এজ মানেই বয়স। অতএব 'আমরা টিনএজ বয়সে এসব করিনি' না বলে বলতে হবে 'আমরা টিনএজে এসব করিনি।'

২১. ভিআইপি মানেই ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন। অতএব 'রাস্তা দিয়ে ভিআইপি পার্সন যাচ্ছেন' না বলে বলতে হবে 'রাস্তা দিয়ে ভিআইপি যাচ্ছেন।'

২২. সিনিয়র মানেই বড় কেউ। তাই 'ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র বড় ভাই' না বলে 'ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র' বা 'ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই' বলতে হবে। একই কারণে 'ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র ছোট ভাই' না বলে বলতে হবে 'ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র' কিংবা 'ডিপার্টমেন্টের ছোট ভাই'।

বাহুল্যদোষের দুষ্টুমি-২

কথাবার্তায় কিঞ্চিৎ ইয়াম্মি-ভাব আনতে কিংবা তিন আঙ্গুলের মাথার এক চিমটি উত্তরাধুনিকতা যোগ করতে অনেকেই কথার ফাঁকে বা লেখার মাঝে অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের আমদানি ঘটিয়ে থাকেন। যেসব শব্দের যথাযথ ও প্রচলিত বাংলা আছে; 'লেখ্য' ভাষায় সেসব শব্দের অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার কেবল আপত্তিকর না, ক্ষেত্রবিশেষে বিরক্তিকরও। 'কথ্য' ভাষায় অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দ কোনোমতে হজমযোগ্য হলেও 'লেখ্য' বাংলায় অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের অপব্যবহার নেহায়েতই বদহজম ঘটায় এবং বিবমিষার উদ্রেক করে। তাও যদি অপ্রয়োজনীয় ইংরেজিটা কেউ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করেন, মানা যায়। এমনিতেই অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি, এর ওপর কেউ যদি একে ভুলভালভাবে ব্যবহার করেন, তা হলে মেজাজ সপ্তমে না উঠে পারে না।

ভাষার অপব্যবহার নিয়ে এর আগে অজস্র লেখা লিখেছি। এবার এমন একটা ভুলের ব্যাপারে আলোকপাত করব, যে ভুলটা প্রায় প্রত্যেকেই একবার-না-একবার করেছেন। ভুলটা বচনজনিত। অনেকেই 'হেটার্সরা বলবে' কথাটা ব্যবহার করেন। হেটার মানে নিন্দুক হলে হেটার্স মানে নিন্দুকরা। তা হলে হেটার্সরা মানে কী? নিন্দুকরা-রা? কী অর্থ দাঁড়ায় এর? বলতে হবে 'হেটাররা'। ভালো হয় এসব না বলে 'নিন্দুকরা' বললে।

অনেকেই বলেন– 'একটা জোকস বলো তো।' জোক মানে কৌতুক এবং শব্দটি একবচন বা সিঙ্গুলার, আর 'জোকস' বহুবচন বা প্লুরাল। তা হলে 'একটা জোকস' হবে? নাকি 'একটা জোক' হবে? 'তোমার কমেন্টসটা' হবে? নাকি 'তোমার কমেন্টটা' হবে?

খেলা নিয়ে আলাপের সময়ে একটা শব্দ প্রায়ই চলে আসে– সাপোর্টার্সরা। অথচ এখানে 'সাপোর্টার্স' নিজেই বহুবচন এবং এখানে 'রা' যোগ করার কোনোই দরকার নেই। হবে 'সাপোর্টাররা'।

ফেসবুকে দেখি অনেকেই 'ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে' কিংবা 'ফ্রেন্ডসরা মিলে' ঘুরতে যান। 'ফ্রেন্ড' শব্দটি একবচন, 'ফ্রেন্ডস' বহুবচন। 'দের' বা 'রা' বসবে 'ফ্রেন্ড'-এর পরে, 'ফ্রেন্ডস'-এর পরে না। অর্থাৎ ঘুরতে যেতে হবে 'ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে' বা 'ফ্রেন্ডরা মিলে'; 'ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে'ও না, 'ফ্রেন্ডসরা মিলে'ও না। একইভাবে, স্টুডেন্টসরা, রিলেটিভসরা, প্যারেন্টসরা, কাজিন্সরা, ক্রিকেটার্সরা, ফলোয়ার্সরা, লিসেনার্সরা না লিখে যথাক্রমে স্টুডেন্টরা, রিলেটিভরা, প্যারেন্টরা, কাজিনরা, ক্রিকেটাররা, ফলোয়াররা, লিসেনাররা লিখতে হবে।

কেউ-কেউ বলেন– 'টপিক্সটা বাদ দে'। অথচ 'টপিক্সটা' না হয়ে শব্দটা হবে 'টপিকটা'। আবার কেউ মন্তব্য করেন– 'পিক্সটা দারুণ হয়েছে।' পিকচারের সংক্ষিপ্ত রূপ হিশেবে সম্প্রতি 'পিক' শব্দটি পরিচিতি পেলেও বাক্যটি হতে হবে 'পিকটা দারুণ হয়েছে।' অবশ্য 'ছবি'র মতো নান্দনিক-কাব্যিক একটি শব্দ থাকতে কেন 'পিকচার', 'পিক্স' বা 'পিক' লিখতে হবে, তা আমার বুঝে আসে না।

অনেকে বলেন– 'বিদেশে যাওয়ার ফর্মালিটিজগুলো শেষ করলাম' কিংবা 'বিদেশের রুলসগুলো খুব কড়া'। এখানেও যথারীতি বাহুল্যদোষ ঘটেছে এবং শব্দ দুটো হবে 'ফর্মালিটিগুলো' ও 'রুলগুলো'।

একটিমাত্র শব্দে একাধিক ভুলও ঘটিয়ে ফেলেন অনেকে। অনেককে বলতে শুনেছি বা লিখতে দেখেছি– 'এই এলাকার পিপলসরা অতিথিপরায়ণ'। 'পিপল' মানে জনগণ, অর্থাৎ 'পিপল' নিজেই এখানে বহুবচন; 'পিপল'কে 'পিপলস' বানানোয় হলো এক ভুল, 'পিপলসরা' বানানোয় হলো দুই ভুল। এইজাতীয় ভুল যারা করেন, তাদেরকে দেখে আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাই– শৈশব থেকে এরা যে লবণ খেয়ে আসছেন, লেবুর রস ফেললে সে লবণ বেগুনি রঙ ধারণ করবে না।

(বচন নিয়েই যখন কথা হচ্ছে, তখন একটা কথা বলে রাখি– ইংরেজিতে দুটো বহুবচন পরপর বসলেও বাংলায় দুটো বহুবচন পরপর বসবে না। ইংরেজিতে all the students হলেও বাংলায়

'সব ছাত্ররা' না হয়ে 'সব ছাত্র' হবে। 'সব নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা' না লিখে লিখতে হবে 'সব নিহতের প্রতি শ্রদ্ধা।' একই কারণে 'সকল বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ' না লিখে লিখতে হবে 'সকল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ।' রেডিওতে 'সব লিসেনার্সদেরকে ওয়েলকাম' না বলে বলতে হবে 'সব লিসেনারকে ওয়েলকাম।')

বাংলা বাক্যে অপ্রয়োজনীয় ইংরেজির বচনজনিত ভুলভাল নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম; সে ভুলগুলো ঘটতই না, যদি ঐ অপ্রয়োজনীয় ইংরেজিগুলো ব্যবহারই করা না হতো। উল্লিখিত প্রত্যেকটা ইংরেজি শব্দেরই (কাজিন বাদে) যথাযথ ও প্রচলিত বাংলা শব্দ আছে। ইয়াম্মি হতে গিয়ে বা আধুনিক সাজতে গিয়ে বেহুদা ইংরেজি ব্যবহার করতে গিয়েই এই হাস্যকর ভুলগুলোর জন্ম দিয়ে চলছেন কতিপয় অতি-উৎসাহী।

ণত্ব বিধান

১. ঋ, র, ষ বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়; যেমন : ঋণ, বর্ণ, কারণ, ধারণা, দারুণ, বিষ্ণু, বরণ, ঘৃণা।

২. যদি ঋ, র, ষ বর্ণের পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ থাকে; এর পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায়; যেমন : কৃপণ, নির্বাণ, নির্মাণ, পরিবহণ, গ্রহণ, শ্রবণ।

৩. ট-বর্গের পূর্বের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়, যেমন : বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড, ঘণ্টা।

বাংলা ক্রিয়াপদের অন্তঃস্থিত দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না, যেমন : ধরেন, মারেন, করেন।

বিদেশী শব্দের দন্ত্য-ন কখনোই মূর্ধন্য-ণ হয় না; যেমন : কোরান, জার্মানি, ফরমান, ফ্রান্স, রিপন, লন্ডন, ড্যান্ডি, ইন্ডিয়া, প্রিন্ট, পেন্টাগন, মডার্ন, ইস্টার্ন, পর্নোগ্রাফি, কর্নার, বার্ন, হর্ন, পপকর্ন।

সন্ধি বা সমাসনিষ্পন্ন শব্দে ণ হয় না; যেমন : দুর্নীতি, দুর্নিবার, দুর্নাম, ত্রিনয়ন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ধারণা ও দারুণ বানানে ণ হলেও ধরন ও দরুন বানানে ন। বর্ণ থেকে উদ্ভূত বরনে ন হলেও বরণ করে নেওয়ার বরণে ণ। এছাড়া ধরনা, ঝরনা বানানে ন। ঠান্ডা বানানে ন।

য়ত্ব বিধান-১

নতুন এক ধরনের ভাষাদূষণ মহামারি আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেটি হচ্ছে 'ই' ও 'য়'-এর অদ্ভুতুড়ে ব্যবহার। কোথায়, আমায়, বাসায়, কয়জন, হয়তো, প্রায়, উপায়, জায়গা, সবাই, অবশ্যই, নেই ইত্যাদিকে অনেকেই যথাক্রমে কোথাই, আমাই, বাসাই, কইজন, হইতো, প্রাই, উপাই, জাইগা, সবায়, অবশ্যয় ও নেয় লিখছে!

১. সে কী হয় তোমার?
২. এতে আমার কিছু আসে-যায় না।
৩. ছেলেটি কলেজে যায়।
৪. সে মাছ খায় না।
৫. সে আমাকে জানায়নি।
৬. তার লেখায় জাদু আছে।
৭. এই এলাকায় মাছ পাওয়া যায় না।

উল্লিখিত বাক্যগুলোকে অনেকেই লিখছে এভাবে–

১. সে কী হই তোমার?
২. এতে আমার কিছু আসে-যাই না।
৩. ছেলেটি কলেজে যাই।
৪. সে মাছ খাই না।
৫. সে আমাকে জানাইনি।
৬. তার লেখাই জাদু আছে।
৭. এই এলাকাই মাছ পাওয়া যাই না।

আবার–

১. আমি যাই না।
২. যাহা চাই, তাহা পাই না।
৩. আমি তাকে কিছু জানাইনি।

৪. আমার কোনো সমস্যা নেই।
৬. একমাত্র তার লেখাই আমার ভালো লাগে।

এই বাক্যগুলোকে অনেকেই লিখছে এভাবে–

১. আমি যায় না।
২. যাহা চায়, তাহা পায় না!
৩. আমি তাকে কিছু জানায়নি।
৪. আমার কোনো সমস্যা নেয়।
৫. একমাত্র তার লেখায় আমার ভালো লাগে।

'ই' ও 'য়'-এর এই অদ্ভুত ও বিশ্রী দূষণ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। লেখায় লুতুপুতু ভাব আনার জন্য অনেকে ইচ্ছে করেই প্রথম দিকে এই অপকর্মটি করত, পরবর্তীতে অভ্যেসে পরিণত হয়ে যাওয়ায় তারা এটি আর ছাড়তে পারেনি। অতিব্যবহারের ফলে ফেসবুকে এটি ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং কমবয়সী অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে আসলে কোথায় 'ই' আর কোথায় 'য়' বসবে!

কম্পিউটারে অভ্রতে বা ফোনে ডাউনলোডকৃত সফটওয়্যারে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবশত অনেক সময়েই 'ই' ও 'য়' গুলিয়ে যেতে পারে ঠিকই; কিন্তু এটাই অধিক ঠিক যে, লেখায় লুতুপুতু ভাব আনতে গিয়েই আজ এই অহেতুক অক্ষরবিপর্যয়ের সৃষ্টি। ফেসবুকে ই আর য় নিয়ে ভজকট পাকিয়ে যারা সফটওয়্যারের দোহাই দিচ্ছে, তারা কাগজে-কলমে লেখার সময়েও একই ভুল করছে। অতএব, সমস্যা সফটওয়্যারে না, সমস্যা ঘিলুতে।

মনে রাখতে হবে– শুধু উত্তম পুরুষের (আমি ও আমরা) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদে 'ই' বসবে এবং বাকি সব ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদে 'য়' বসবে। যেমন :

আমি চাই/ যাই/ খাই।
আমরা চাই/ যাই/ খাই।
সে চায়/ যায়/ খায়।
করিম চায়/ যায়/ খায়।

তারা চায়/ যায়/ খায়।

বাংলা লেখার সময়ে অনেকের ভেতরেই এমন তাচ্ছিল্য আর অযত্নের ভাব চলে আসে যে, তা লক্ষ করলে বিবমিষার উদ্রেক ঘটে। মাতৃভাষায় লেখার ক্ষেত্রে এত অযত্ন-অবহেলা বোধহয় আমরা বাঙালিরাই সবচেয়ে বেশি করি। অজ্ঞতাবশত ভুল করে থাকলে তা মানা যায়, কিন্তু ইচ্ছা করে ভাষা বিকৃত করে ভাষানৈরাজ্যের সৃষ্টি করলে তা কোনোক্রমেই মানা যায় না।

৪ এপ্রিল ২০১৫

য়ত্ব বিধান-২

১. আমি/আমরা খাই (খায় না)।
২. সে/তারা/রহিম/করিম খায় (খাই না)।
৩. আমি/আমরা যাই (যায় না)।
৪. সে/তারা/রহিম/করিম যায় (যাই না)।
৫. আমার পরান যাহা চায় (চাই না), তুমি তা-ই (তায় না) গো।
৬. চাইছি (চায়ছি না) তোমার বন্ধুতা।
৭. যাইতেছিলাম (যায়তেছিলাম না) বন্ধুর বাড়ি, উপায়-বুদ্ধি (উপাই-বুদ্ধি না) মেলে না।

৮. হইতাম (হয়তাম না) যদি পানের দোকানদার; মিষ্টি জর্দার পান খাওয়াইতাম (খাওয়ায়তাম না), কাইড়া (কায়ড়া না) নিতাম মন তোমার।

৯. ঐ কদমগাছতলায় (তলাই না) বন্ধু আমার বাঁশের বাঁশি অসময়ে বাজায় (বাজাই না); আমি কইতেও (কয়তেও না) পারি না, সইতেও (সয়তেও না) পারি না, বন্ধুর লাগি পরান আমার শুধু ছটফটায় (ছটফটাই না)।

১০. চল রাস্তায় (রাস্তাই না), সাজি ট্রামলাইন আর কবিতায় (কবিতাই না) শুয়ে কাপলেট।

১১. আমি আগের ঠিকানায় (ঠিকানাই না) আছি, সময় (সমই না) করে এসো একদিন।

১২. খুব সমস্যায় (সমস্যাই না) পড়েছি।
১৩. কোথায় (কোথাই না) জায়গা (জাইগা না) কিনেছ?
১৪. বড় অবেলায় (অবেলাই না) তুমি এলে।
১৫. বইমেলায় (বইমেলাই না) দেখা হবে।
১৬. বইমেলাই (বইমেলায় না) আমাদের প্রাণের মেলা।
১৭. শিক্ষাই (শিক্ষায় না) জাতির মেরুদণ্ড।
১৮. আমি ঢাকায় (ঢাকাই না) থাকি।

১৯. এখন ঢাকাই (ঢাকায় না) আমার একমাত্র ঠিকানা।
২০. ঢাকাই শাড়ি (ঢাকায় শাড়ি না)
২১. গাইতে-গাইতে (গায়তে-গায়তে না) গায়েন।
২২. ব্রিটল বিস্কুট খাইতে-খাইতে (খায়তে-খায়তে না) যায় (যাই না) বেলা।
২৩. নাও ছাইড়া (ছায়ড়া না) দে রে, মাঝি, পাল উড়াইয়া (উড়ায়য়া না) দে।
২৪. বাইসাইকেল (বায়সায়কেল না)
২৫. কার্বনডাই অক্সাইড (কার্বনডায় অক্সায়ড না)
২৬. টাইব্রেকার (টায়ব্রেকার না)
২৭. ওয়াই-ফাই (ওয়ায়-ফায় না)
২৮. ভায়রা ভাই (ভাইরা ভায় না)
২৯. পায়রা (পাইরা না)
৩০. ময়লা, কয়লা, পয়লা, ব্রয়লার, শয়তান (-ই- না)
৩১. আমি তোমার কী হই? (হয় না)
৩২. সে তোমার কী হয়? (হই না)
৩৩. তুমি কই (কয় না) থাকো?
৩৪. তোমার কয় (কই না) ভাইবোন? (ভায়বোন না)
৩৫. আমি কয়টায় (কইটাই না) আসব?
৩৬. হায় রে (হাই রে না) মানুষ!
৩৭. আয়, যাই গা। (আই, যায় গা না)
৩৮. আমি কী দেব তোমায়? (তোমাই না) তুমি কী দেবে আমায়? (আমাই না)
৩৯. চিপায়-চাপায় (চিপাই-চাপাই না)
৪০. এভাবে পইপই (পয়পয় না) করে বুঝিয়ে (বুঝাই/বুঝায়/বুঝায়ে/বুঝায়া না) বলার পরও যারা এই ভুলগুলো করবে, কানের নিচে ছয়টা (ছইটা না) চটকানা মেরে তাদেরকে বয়রা (বইরা না) করে দিন, খাম্বায় (খাম্বাই না) বেঁধে পাছায় (পাছাই না) মান্দারগাছের ডাল দিয়ে শপাং-শপাং (অথবা ট্রস-ট্রস) করে নয়টা (নইটা না) বাড়ি মারুন এবং আবার প্রাইমারি (প্রায়মারি না) স্কুলে ভর্তি করিয়ে (করাই/করায়/করায়ে/করায়া না) দিন।

সুচিত্রা সুচি হলে বিচিত্রা কী

'ছবি' শব্দটার মধ্যে এক ধরনের নান্দনিকতা আছে, আছে কাব্যিকতা-ছান্দসিকতার মিলন। ভাই, আপা, দিদি, বুবু ইত্যাদি সম্বোধনের মধ্যে আছে প্রাণের টান, আছে রক্তের প্রগাঢ় প্রবাহ। স্বামী শব্দটা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বউ শব্দটা অবিসংবাদিত। বউ শব্দটার মধ্যে প্রেম আর প্রণয়ের যে ব্যঞ্জনা আছে, তা অনির্বচনীয়।

তোমরা যারা ছবি, ভাই, আপা, দিদি, বুবু, স্বামী শব্দগুলোকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ছবিকে বলছ পিক, ভাইকে ডাকছ ব্রো, আপা-দিদি-বুবুকে ডাকছ সিস; যারা স্বামীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ হাবি আর বাগদত্তাকে ফিয়সেঁ বলে, প্রেমিকাকে গফ আর প্রেমিককে বফ বলে; তারা কেবল একটা কথাই জেনে রেখো যে, ছবি-ভাই-দিদি-বুবু-বউ-স্বামী শব্দগুলো উচ্চারিত হয় বাঙালির বুক থেকে, হৃদয় থেকে, মগজ থেকে। আর পিক-ব্রো-সিস-হাবি-ফিয়সেঁ-বফ-গফ উচ্চারিত হয় বাঙালির পশ্চাৎপ্রকোষ্ঠ থেকে।

সবকিছু সংক্ষেপ করা যায় না, সবকিছু সংক্ষেপ করা ঠিক না। ভালোবেসে অর্চিতাকে সংক্ষেপে অর্চি ডাকা যায়, পুষ্পিতাকে পুষ্পি ডাকা যায়, সুচিত্রাকে ডাকা যায় সুচি; এ পর্যন্ত ঠিক আছে। বিচিত্রাকে ভালোবেসে সংক্ষেপে এভাবে ডাকতে গেলে সমূহ আপদের আশঙ্কা আছে।

কনিষ্ঠ–জ্যেষ্ঠ

গতকালের প্রথম আলোয় 'বিজ্ঞানে কনিষ্ঠতম নোবেলজয়ী' শিরোনামে আহমদ মোস্তফা কামালের একটি লেখা ছাপা হয়েছে। উল্লেখ্য 'কনীয়ান' অর্থ দুয়ের মধ্যে ছোট এবং 'কনিষ্ঠ' অর্থ সবার মধ্যে ছোট। অর্থাৎ কনিষ্ঠ নিজেই 'সুপারলেটিভ ডিগ্রি', এর সাথে 'তম' যোগ করার কোনোই দরকার নেই। 'কনিষ্ঠতম' শব্দটি খুবই দৃষ্টিকটু রকমের ভুল। শিরোনামটি হওয়া উচিত ছিল 'বিজ্ঞানে কনিষ্ঠ নোবেলজয়ী'।

একইভাবে জ্যেষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতম শব্দ দুটোও ভুল; জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ লিখলেই চলবে; জ্যেষ্ঠ মানেই সবার চেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ মানেই সবার মধ্যে সেরা; এদের সাথেও 'তম' যোগ করা নিষ্প্রয়োজন।

বানান ও ব্যাকরণের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রত্যেকের জন্য জরুরি, সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকটির জন্য এই সতর্কতা আরো বেশি জরুরি।

৭ নভেম্বর ২০১৬

শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

এক ধরনের রাজনৈতিক পোস্টার প্রায়ই লক্ষ করি। ধরি, মোতাহার খাঁ ঢাকা মহানগর আওয়ামি লিগের আপ্যায়ন-বিষয়ক সম্পাদক নিযুক্ত হলেন এবং সংগঠনটির সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সভাপতি আতাহার খাঁ। মোতাহার খাঁ বা তার কর্মীরা পোস্টারে লিখলেন– 'জননেতা মোতাহার খাঁকে ঢাকা মহানগর আওয়ামি লিগের আপ্যায়ন-বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার মোট তিনটি–

১. নির্বাচন
২. শেখ হাসিনা
৩. শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রথমত, বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো পদে নির্বাচন হয় না, নিয়োগ হয়। অতএব মোতাহার খাঁ আপ্যায়ন-বিষয়ক সম্পাদক পদে 'নির্বাচিত' হননি, 'নিযুক্ত' হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, একটি ইউনিটের আপ্যায়ন-বিষয়ক সম্পাদক কে হবেন, এত ছোট ব্যাপারে শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ করার কথা না। এ ব্যাপারে তাকে শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন জানানোর কিছু নেই। জানালে জানানোর কথা ঐ কমিটির সভাপতি আতাহার খাঁকে, সভাপতিই কমিটির অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগ করেন। তৃতীয়ত, 'শুভেচ্ছা' বা 'অভিনন্দন' জিনিশটা এখানে শেখ হাসিনা বা আতাহার খাঁর প্রাপ্য না, প্রাপ্য মোতাহার খাঁর। শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন নিয়োগকারীর জন্য না, নিযুক্তের জন্য। নিয়োগকারীর জন্য প্রাপ্য হচ্ছে 'ধন্যবাদ' ও 'কৃতজ্ঞতা'। তা হলে পোস্টারটির কাঙ্ক্ষিত ভাষা হবে এমন– ঢাকা মহানগর আওয়ামি লিগের আপ্যায়ন-বিষয়ক সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় জননেতা মোতাহার খাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং তাকে নিযুক্ত করায় ঢাকা মহানগর আওয়ামি লিগের সভাপতি আতাহার খাঁকে ধন্যবাদ।

মনে করি, বদরুল বাহার নামক কাউকে শেখ হাসিনা আওয়ামি লিগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বানালেন। তার পোস্টারের শুদ্ধ ভাষা হবে এ রকম– আওয়ামি লিগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা জননেতা বদরুল বাহারকে আওয়ামি লিগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নিযুক্ত করায় শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এবং বদরুল বাহারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

২০ অক্টোবর ২০১৬

এ–অ্যা

ইংরেজি শব্দ বাংলায় লিখতে গিয়ে, যেখানে এ-কার ব্যবহার করতে হবে; অনেকেই সেখানে ব্যবহার করেন য-ফলা। আর যেখানে ব্যবহার করতে হবে য-ফলা, সেখানে বসিয়ে দেন এ-কার। যেখানে যাকে বসানো দরকার, সেখানে তাকে না বসানোর বাজে অভ্যাস আমাদের সর্বত্রই বিরাজমান। যেমন : এই পোস্টে মোতাহারকে 'ম্যানশন' করে দাও। শব্দটা এখানে ম্যানশন হবে না, হবে মেনশন। আবার ঐ মোতাহারের নামেই কোনো বাড়ি থাকলে সেটার নাম হবে 'মোতাহার ম্যানসন', যেটাকে অনেকেই লেখেন মেনসন।

১. ম্যাসেজ না, মেসেজ। মেনেজ না, ম্যানেজ।
২. ম্যাসেঞ্জার না, মেসেঞ্জার। মেপ না, ম্যাপ।
৩. ম্যান্টাল না, মেন্টাল। মেগাজিন না, ম্যাগাজিন।
৪. ফ্ল্যাক্সিলোড না, ফ্লেক্সিলোড। ফ্লেট না, ফ্ল্যাট।
৫. এডভোকোট না, অ্যাডভোকেট। অ্যানার্জি না, এনার্জি।
৬. একাউন্ট না, অ্যাকাউন্ট। অ্যারিয়া না, এরিয়া।

৭. স্কুল এন্ড কলেজ না, স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ইয়ার অ্যান্ডিং না, ইয়ার এন্ডিং।
৮. চেটিং না, চ্যাটিং। চ্যাকবই না, চেকবই।
৯. পদ্মা সেতুর স্পেন না, পদ্মা সেতুর স্প্যান। স্প্যাশাল না, স্পেশাল।
১০. বেংক না, ব্যাংক। ব্যাকারি না, বেকারি।
১১. নেশনাল না, ন্যাশনাল। ন্যাগেটিভ না, নেগেটিভ।
১২. সেন্ডউইচ না, স্যান্ডউইচ। স্যান্ড মানি না, সেন্ড মানি।

১৩. ভেকেন্সি না, ভ্যাকেন্সি। ভ্যাসপা না, ভেসপা।
১৪. হেটস অফ না, হ্যাটস অফ। হ্যাল্প না, হেল্প। হ্যাটার না, হেটার।
১৫. গেস্ট্রিক না, গ্যাস্ট্রিক। গ্যাস্ট এপিয়ারেন্স না, গেস্ট

অ্যাপিয়ারেন্স।

১৬. স্টেম্প না, স্ট্যাম্প। স্ট্যাডিয়াম না, স্টেডিয়াম।

১৭. পেন পেসিফিক না, প্যান প্যাসিফিক। প্যাপার না, পেপার।

১৮. এপ, এপেক্স, একটিভ, রিএক্ট, রিএকশন, ডিএকটিভেট, এলকোহল, এসোসিয়েশন, এমনেস্টি, এটেনডেন্স, এজমা, এডাম না; অ্যাপ, অ্যাপেক্স, অ্যাকটিভ, রিঅ্যাক্ট, রিঅ্যাকশন, ডিঅ্যাকটিভেট, অ্যালকোহল, অ্যাসোসিয়েশন, অ্যামনেস্টি, অ্যাটেনডেন্স, অ্যাজমা, অ্যাডাম।

সম্ভাবনা–আশঙ্কা

'সম্ভাবনা' ব্যবহৃত হবে ইতিবাচক অর্থে আর নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হবে 'আশঙ্কা'। যেমন–

১. এবার সারা দেশে ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা আছে, সেইসাথে আছে বন্যার আশঙ্কাও। যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে ক্ষতি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, নইলে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ আর মহামারির আশঙ্কা। বিপদের আশঙ্কা মাথায় রেখে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে তবেই হাতছানি দেবে সুন্দর সকালের সম্ভাবনা।

২. লোকটার অবস্থা এখন এতই খারাপ যে, তার আর বেঁচে থাকার আদৌ সম্ভাবনা নেই; তার যেকোনো মুহূর্তে মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়েই সে এখন দিনাতিপাত করছে। সে মরে গেলে তার সন্তানরা গৃহবিবাদে লিপ্ত হবে বলেও আশঙ্কা আছে। এরা খুনোখুনি করে বসবে– এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তারা মিলেমিশে থাকবে– এমন সম্ভাবনা নেই।

ইংরেজি ক্লাস-১

একটি বাংলা বাক্য লিখতে যারা একাধিক ভুল করেন, তাদের অনেকেই প্রচ্ছন্ন গর্ব ও প্রকাশ্য তাচ্ছিল্য নিয়ে বলে থাকেন, 'আসলে বাংলাটা আমি খুব-একটা ভালো পারি না।'

এবং তারা প্রকারান্তরে এটাও বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন যে, বাংলায় দুর্বল হলেও তারা ইংরেজিতে হাফেজ। কিন্তু চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটি হচ্ছে যারা মাতৃভাষা বাংলায় একটি বাক্য লিখতে ক্ষমার অযোগ্য রকমের একাধিক ভুল করেন, তাদের ইংরেজির অবস্থাও তথৈবচ; ইংরেজি বাক্যেও তারা দেদার ভুল করেন, বাংলা কথোপকথনে বা বাংলা লেখার ভেতরেও তারা ব্যবহার করেন ভুলভাল ইংরেজি শব্দ। বাংলার ভুল নিয়ে ইতোমধ্যে অজস্র পোস্ট লিখলেও ইংরেজির ভুলগুলো নিয়ে এর আগে কখনও আমার পোস্ট লেখা হয়নি। ফেসবুকের বিখ্যাত অনেকের পোস্টে ইংরেজি শব্দের ভুল প্রয়োগ দেখি, ভুলটা প্রকাশ্যে না ধরে পছন্দের অনেককে ইনবক্সে ভুলটা ধরিয়ে দেই। এতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। ভুল ধরিয়ে দেওয়াটাকে অনেকে অপরাধ মনে করে থাকেন, যেন বহাল তবিয়তে ভুলের মিছিল চালিয়ে যাওয়াও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো তাদের মৌলিক অধিকার।

খুব বিখ্যাত অনেককে লিখতে দেখি 'গ্রিনিজ বুক' কিংবা 'গ্রিনিচ বুক'। জিনিশটা আসলে 'গিনেস বুক' (Guinness Book)। ব্রিটেনে 'গ্রিনিচ মানমন্দির' বলে একটা স্থাপনা আছে, এককালে বাংলাদেশ ক্রিকেটদলের কোচ ছিলেন গর্ডন গ্রিনিজ। গ্রিনিচ মানমন্দির বা গর্ডন গ্রিনিজের সাথে 'গিনেস বুক'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বিরক্ত হয়ে অনেকেই লেখেন– 'নাটকের মাঝে টিভিতে বেশি add দিচ্ছে!' হাসিমাখা ছবিতে কেউ-কেউ মন্তব্য করেন– 'ক্লোজআপের add দিচ্ছ নাকি?' আসলে advertisement-এর ছোট্ট রূপটা add না, ad। এই add মানে যুক্ত করা।

যখন বাংরেজিতে না লিখে বাংলা হরফে বাংলায় বা ইংরেজি হরফে ইংরেজিতে লিখতে বলি; তখন অনেকেই বলেন– 'আমার বাংলা front নেই।' এই শব্দটা front না, font। 'বাংলা ফ্রন্ট', 'ইংরেজি ফ্রন্ট' না। এগুলো 'বাংলা ফন্ট', 'ইংরেজি ফন্ট'। রাজনীতিতে ঐক্যফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্ট, ছাত্রফ্রন্ট থাকে; হরফে থাকে ফন্ট।

message-কে বাংলায় অনেক বিখ্যাত জনই 'ম্যাসেজ' লেখেন। এটা হবে 'মেসেজ'। আর নাপিতকে দিয়ে শরীরমর্দন হচ্ছে 'ম্যাসাজ'। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা অনেকেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে university ও varsity বানান দুটোয় ভুল করেন। স্মর্তব্য যে, university বানানে e আর varsity বানানে a। সাধারণ মানুষজন থেকে আরম্ভ করে সংবাদপত্রগুলোও অনেক সময়ে 'হ্যাট্রিক' লিখে থাকে। শব্দটা আসলে 'হ্যাট-ট্রিক' (hat-trick)। প্রায় সবাই per-cent-কে বাংলায় লেখে 'পার্সেন্ট', কিন্তু লিখতে হবে 'পার-সেন্ট'। এই মডার্ন যুগের অধিকাংশ মর্ডান জনই যখন 'মডার্ন'-কে 'মর্ডান' বলেন বা লেখেন, তখন তাদের মেকি মডার্নিটি দেখে হাসি না এসে পারেই না।

ফোন নাম্বার চাইতে গিয়ে অনেকেই বলেন 'কনট্র্যাক্ট নাম্বারটা দেন', বাসের টিকেট কাটার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিটিকে অনেকে বলেন 'কনট্র্যাক্টর'। আসলে contact অর্থ 'যোগাযোগ করা', ফলে ফোন নাম্বার হচ্ছে contact number বা 'কনট্যাক্ট নাম্বার'। বাসে টিকেট কাটেন যিনি, তিনি হচ্ছেন conductor বা 'কনডাক্টর'। আর contract মানে চুক্তি, contractor হচ্ছেন ঠিকাদার। ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে অনেক নারীই মন খারাপ করে লিখে থাকেন– 'পার্টস ছিনতাই হয়ে গেছে।' ঐ জিনিশটা আসলে 'পার্টস' না, ওটা 'পার্স' (purse)।

অনেককেই বলতে শোনা যায় বা লিখতে দেখা যায়– 'বইটার প্রাইজ কত?' দামের ইংরেজি 'প্রাইজ' না, 'প্রাইস'। বলাই বাহুল্য যে, 'প্রাইজ' মানে 'পুরস্কার'। সার্জেন্ট আর সার্জনকেও অনেকে গুলিয়ে ফেলেন। কেউ-কেউ লেখেন 'ট্রাফিক সার্জন', 'সিভিল সার্জেন্ট'! এ

দুটো হবে 'ট্রাফিক সার্জেন্ট' আর 'সিভিল সার্জন'।

বেড়াতে যাওয়ার সময়ে অনেকেই লেখেন On the way of Cox's Bazar, পৌঁছার পরে লেখেন Just have reached at Cox's Bazar! এই বাক্য দুটো হবে যথাক্রমে On the way to Cox's Bazar এবং Just have reached Cox's Bazar। আবার Reached at home safely না লিখে লিখতে হবে Reached home safe।

ভুলভাল বাংলা, ভুলভাল ইংরেজি লিখেও অনেকে সরকারের বড় কর্তা হয়ে যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যান। এসব কর্তাদের ভাষাজ্ঞান দেখলে লজ্জায় ভর্তা হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ভুল করা বা ভুল জানাটা অপরাধ না, কিন্তু অন্যে ভুলটা ধরে শুদ্ধটা জানিয়ে দেওয়ার পরও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করাটা কিংবা ভুল ধরিয়ে দেওয়া শুভাকাঙ্ক্ষীটিকে উলটো তিরস্কার করাটা বা ভুল করাকে নিজের মৌলিক অধিকার মনে করাটা অপরাধের পর্যায়েই পড়ে। মনে রাখতে হবে– দুর্গন্ধ কেবল নর্দমা থেকেই আসে না, ভুল লেখা ও ভুল উচ্চারণ থেকেও দুর্গন্ধ আসে।

২৩ মে ২০১৪

ইংরেজি ক্লাস-২

এই বঙ্গীয় জনপদে 'নামের বানানে ভুল নেই' বলে যে প্রবচনটি প্রচলিত আছে, সেটি মূলত একটি কুসংস্কার। আসলে অজ্ঞতা ধামাচাপা দেওয়ার প্রবণতা আর ভুল অস্বীকারের ঐতিহ্য থেকেই এই প্রবচনের উৎপত্তি। অনেকে নামের ভুল বানানের জন্য স্কুলশিক্ষক বা মা-বাবাকে দায়ী করলেও ঘেঁটে দেখেছি নিজ সন্তানের নামটিও তারা ভুল বানানেই লিখে চলছেন, নিজেও হরদম ডুবে আছেন ভুল বানানের নর্দমায় এবং বানানভুলের এই মচ্ছব চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

অনেককেই দেখেছি নামের ইংরেজি বানানে অতিরিক্ত একটি বর্ণ ব্যবহার করতে, যেটি গোটা নামের উচ্চারণই পালটে দেয়। সালেহ্ নামের অনেককেই ইংরেজিতে লিখতে দেখেছি Shaleh, যার উচ্চারণ শালেহ্। অথচ নামটির বানান Saleh। এই ভুলটি নির্বিষ হলেও ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে সালাউদ্দিনে। অনেক সালাউদ্দিনই সালাউদ্দিনকে ইংরেজিতে Sala Uddin না লিখে লেখেন Shala Uddin, যার উচ্চারণ শালা উদ্দিন!

একাধিক নুসরাত-ইসরাতকে দেখেছি ইংরেজিতে Nusrat বা Israt না লিখে Nusrath ও Israth লিখতে, যাদের উচ্চারণ নুসরাথ ও ইসরাথ। একজন প্রমিত ও একজন সামিতকে দেখলাম Pramit ও Samit না লিখে Pramith আর Samith লিখতে, যাদের উচ্চারণ প্রমিথ আর সামিথ। এক বিভু নিজের নামটি ইংরেজিতে Bibhu বা Bivu না লিখে লেখে Bivhu, যার উচ্চারণ বিভহু। v নিজেই ভ-এর কাজ করে, এর সাথে আরো একটা h যুক্ত করলে তা ভ-এর কাজ না করে ভয়ের কাজ করে। দেশে যত বাগ আছে, সেসবের দাপ্তরিক ইংরেজি বানানে অতিরিক্ত একটি করে h দেখেছি; যেমন– Malibagh, Shahbagh, Lalbagh, যাদের উচ্চারণ মালিবাঘ,

শাহবাঘ ও লালবাঘ। এই অতিরিক্ত h-ওয়ালাদেরকে কোনোকালে বাঘে কামড়েছিল কি না, খতিয়ে দেখা দরকার।

য-ফলাকে ইংরেজিতে y দিয়ে লেখার একটা প্রচলন আছে। যেমন কল্যাণীকে Kalyani, অনন্যাকে Ananya। এদেরকে Kallani আর Ananna লিখলেও ক্ষতি নেই। ক্ষতি আছে Kallyani আর Anannya লিখলে। n আর l (এল) দুবার লিখলে y ব্যবহার করা যাবে না, y ব্যবহার করলে n আর l (এল) দুবার লেখা যাবে না।

এই বাংলাদেশে প্রচুর শাওন আছেন যারা ইংরেজিতে শাওনকে লেখেন Shawon; এর উচ্চারণ শাওয়ান কিংবা শাঔন। শাওনের ইংরেজি বানান নিছক Shaon, মাঝখানের w-টা একদমই অদরকারি। শর্মা-বেচা দোকানগুলোয় Sharma-কে Shawarma লেখা থাকে, যার উচ্চারণ শাওয়ার্মা। যেসব দোকানে এ রকম বেহুদা w থাকে, সেসব দোকানে শর্মা কাবাব খেতে গেলে মনে হয় ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতি কামড়ে একটি করে w গিলছি।

প্রচুর মেহেদিকে দেখেছি, যারা Mehedi না লিখে Mehedey লেখে। অনেক তন্বীর Tonni-তে পোষায় না, Tonney লেখে।

বাংলা 'এ' যে ইংরেজিতে e দিয়ে আর 'ই' যে i দিয়ে লিখতে হয়, তা অধিকাংশ বাঙালিই জানেন না এবং এই অজ্ঞতাজনিত কারণে কত 'সাজেদা' যে 'সাজাদা' হয়ে আছেন, কত 'আমেনা' যে 'আমানা' হয়ে আছেন আর কত এনামুল-একরাম-এমরান হয়ে আছেন আনামুল-আকরাম-আমরান; এর ইয়ত্তা নেই। ইয়ত্তা নেই কত ঊর্মি হয়ে আছেন ঊর্মে, কত রিমি-সুমি আর যূথী-বীথি হয়ে আছেন রেমে-সুমে আর যূথে-বীথে; এরও।

এখন পর্যন্ত 'শুভেচ্ছা' ও 'উচ্ছ্বাস' নামের যত নর-নারী দেখেছি, এদের কারো নামেরই ইংরেজি বানান এ যাবৎ শুদ্ধ পাইনি। এই নাম দুটোর শুদ্ধ বানান বেশ বড়সড়– Shu-bhech-chha আর Uch-chhwas। পড়ার সুবিধার্থে হাইফেন টেনে দিলাম, লেখার সময়ে হাইফেনগুলো বাদ দিতে হবে।

এ যাবৎ যত 'ঈপ্সিতা' দেখেছি, এদের খুব কম জনকেই দেখেছি বাংলা নামটা ঠিকমতো লিখতে। বেশিরভাগকেই লিখতে দেখেছি ইপ্সিতা, ইপসিতা, ইপশিতা– এসব। ঈপ্সা অর্থ আকাঙ্ক্ষা, ঈপ্সিত মানে কাঙ্ক্ষিত। ঈপ্সিত থেকেই যে ঈপ্সিতা নামের উদ্ভব, তা কজন ঈপ্সিতা জানে; সে ব্যাপারে ঢের সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকে সন্তানের নাম 'আকাঙ্ক্ষা'ও রাখেন এবং বানানে যথারীতি ভুল করেন।

বীথি, যূথী, সিঁথি, রথি, সারথি, পীযূষ, ভুঁইয়া শব্দগুলো যেভাবে লিখলাম; এগুলোই শুদ্ধ রূপ। অনেকেই এই নামগুলো উলটোপালটা বানানে লিখে থাকেন।

আশীষ বানানটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ বানান আশিস। ফলে যত শুভাশীষ-দেবাশীষ আছেন, বানান পালটে শুভাশিস-দেবাশিস লেখা ছাড়া তাদের গতি নেই।

নিজের নামের বানান পালটাতে না পারলে অন্তত অনাগত কারো নাম অশুদ্ধ বানানে না লিখে শুদ্ধ করে লিখতে হবে, যাতে ওরা বড় হয়ে ভুল বানানের দায় পিতা-মাতা বা শিক্ষকদের ওপর চাপাতে না পারে। এখনও যারা পিতা-মাতা হয়নি এবং এখন যারা শিক্ষক, তারা শুদ্ধ বানান শিখলে অন্তত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নামের বানানে ভুল থাকবে না। বাচ্চার নাম নিবন্ধন করার আগে যাচ্ছেতাই বানান ব্যবহার না করে বিশেষজ্ঞ কারো পরামর্শ নিতে হবে, অন্যথায় ঐ বাচ্চাটিকে ভুল বানান বয়ে বেড়াতে হবে আস্ত একটা জীবন ধরে। বানানে ভুল করায় এবং শুদ্ধ বানান শিখে নেওয়ায় অগৌরব নেই; অগৌরব আছে ভুল অস্বীকারের মাঝে, অগৌরব আছে কেউ ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরও 'নামের বানানে ভুল নেই' নামক সেই বস্তাপচা বাক্য আউড়ে ভুল সংশোধন না করার মাঝে।

১৯ এপ্রিল ২০১৭

লেখনী

দারুণ লেখনী।
আপনার লেখনী পড়ে মুগ্ধ হলাম।
এমন লেখনী আজ-কাল চোখেই পড়ে না।

এ ধরনের বাক্য দেখা যায় প্রায়ই। কিন্তু বাক্যগুলো ভুল। শুদ্ধ বাক্য হবে–
দারুণ লেখা।
আপনার লেখা পড়ে মুগ্ধ হলাম।
এমন লেখা আজ-কাল চোখেই পড়ে না।

'লেখনী' আর 'লেখা' এক না। যে বস্তুটি (কলম) দিয়ে লেখা হয়, সেটি হচ্ছে লেখনী। উল্লিখিত বাক্য তিনটিতে 'লেখনী'র বদলে 'কলম' বসালে দাঁড়ায়– দারুণ কলম।

আপনার কলম পড়ে মুগ্ধ হলাম।
এমন কলম আজ-কাল চোখেই পড়ে না।

দুইশো একত্রিশ

ইংরেজি বাক্যে একাধিক সাবজেক্ট (উদ্দেশ্য) থাকলে ২-৩-১ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ একাধিক সাবজেক্টযুক্ত ইংরেজি বাক্যে প্রথমে সেকেন্ড পার্সন (মধ্যম পুরুষ), এর পরে থার্ড পার্সন (নাম পুরুষ) এবং সব শেষে ফার্স্ট পার্সন (উত্তম পুরুষ) লেখা হয়। যেমন : He, I and you went there না লিখে লিখতে হয় You, he and I went there।

বাংলায়ও একই পদ্ধতি (২-৩-১) অনুসরণ করতে হবে। 'সে, আমি ও তুমি গিয়েছিলাম' না লিখে লিখতে হবে 'তুমি, সে ও আমি গিয়েছিলাম।' এখানে ক্রিয়াপদটা কিন্তু 'গিয়েছিলাম'। এই 'গিয়েছিলাম'-এর সাথে কিন্তু 'তুমি' শব্দটা বা 'সে' শব্দটা একেবারেই মানায় না, গোলমেলে লাগে। 'গিয়েছিলাম'-এর সাথে শুধু 'আমি' ও 'আমরা'-ই মানায়।

তাই একাধিক উদ্দেশ্যযুক্ত বাক্যে 'আমি' ও 'আমরা'-কে রাখতে হবে অন্যান্য উদ্দেশ্যের পরে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদটা হবে বাক্যের নিকটতম 'উদ্দেশ্য' অনুযায়ী। 'আমি ও আমার বন্ধুরা প্রচুর মজা করেছি' না লিখে লিখতে হবে 'আমার বন্ধুরা ও আমি প্রচুর মজা করেছি।' একইভাবে 'আমি আর তুমি স্বপ্নের পৃথিবী গড়ব' না লিখে লিখতে হবে 'তুমি আর আমি স্বপ্নের পৃথিবী গড়ব।'

নদ-নদী

বাংলা ভাষায় যেসব অহেতুক ও বেহুদা বিতর্ক জিইয়ে রাখা আছে, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নদী বনাম নদ বিতর্ক। জন্ম থেকেই প্রশ্নটা শুনে এসেছি, ঘাঁটাঘাঁটি করে উত্তর জানার চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করে মাঝারি সাইজের হালকা পিংক কালারের ঘোড়ার প্রমাণ সাইজের মেরুন কালারের একটা চৌকা ডিম পেয়েছি।

এক জায়গায় দেখেছি নামের মধ্যে মেয়ে-মেয়ে গন্ধ থাকলে সেটা নদী আর ছেলে-ছেলে গন্ধ থাকলে সেটা নদ। মেয়েলি নাম বলে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা নাকি নদী; নাম পুরুষালি বলে কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, তুরাগ, বলেশ্বর নাকি নদ। কোনটা নদী, কোনটা নদ– লৈঙ্গিক গন্ধই যদি এর মাপকাঠি হয়; তা হলে মাথাভাঙ্গা, কালিজিরা, কচা নামধারীরা কী– নদী, না নদ? বরিশাল বিভাগে 'হিজলা' নামে যেটি প্রবাহিত আছে, সেটিই বা কী?

কোথাও-কোথাও পড়েছি– যেগুলোর শাখা আছে, অর্থাৎ বাচ্চাকাচ্চা আছে; সেগুলো নদী আর যেগুলোর শাখা বা বাচ্চাকাচ্চা নেই, সেগুলো নদ। খুঁজে দেখলাম– যে ব্রহ্মপুত্রকে নদ বলা হয়; দিবাং, লোহিত, ধানসিঁড়ি, কামেং, রায়ডাক, জলঢাকা, তিস্তা নামে সেই ব্রহ্মপুত্রের সাতটা শাখা নদী আছে (আরো বেশি থেকে থাকতে পারে); সাত-সাতটা বাচ্চা থাকার পরও ব্রহ্মপুত্র নদই থেকে গেল, নদী আর হলো না! নাম পুরুষালি হওয়ার কারণে ব্রহ্মপুত্রের হওয়ার কথা নদ, আবার শাখা থাকার কারণে হওয়ার কথা নদী। কারো মধ্যে উভয় লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকলে তাকে আমরা তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া বলে থাকি। ব্যাকরণপণ্ডিতদের পণ্ডিতি মোতাবেক ব্রহ্মপুত্র কি তবে হিজড়া কিছু? চাইলে আরেক বিতর্কও তোলা যায়– সাত বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র কি গর্ভবতী হয়েছিল, নাকি গর্ভবান?

আমি মনে করি– নদী আর নদ নিয়ে মাথা ঘামানো নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। প্রাণীদের লিঙ্গ থাকে, জল বা জলাশয়ের লিঙ্গ নেই। লিঙ্গ নিয়ে টানাটানি না করে সবগুলোকে নদী বললেই লেঠা চুকে যায়। হয়তো কোনো এক কবি কোনো এক অলস দুপুরে কোনো একটি ছড়া লিখতে গিয়ে বদ বা মদ-এর সাথে অন্ত্যমিল রাখতে গিয়ে ছন্দ মেলাতে না পেরে নদীকে নদ লিখে ফেলেছিলেন। হয়তো তিনি লিখেছিলেন– 'আজকে আমি মাতাল হব, আমায় দে রে মদ; মদ্য পিয়ে পি-এর তোড়ে বইয়ে দেবো নদ!' তার সেই দুপুরের সেই আলস্যের খেসারত এখনও পর্যন্ত দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না।

এখন থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাও নদী, ব্রহ্মপুত্র-কপোতাক্ষ-আড়িয়াল খাঁও নদী। আসামি খালাশ।

৩০ নভেম্বর ২০১৮

বাংলা-বাঙলা

'বাংলা' ও 'বাঙলা' বানানদ্বয়ের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ? আমরা সাধারণত 'বাংলা' লিখতে অভ্যস্ত হলেও এবং সংবিধানে আমাদের ভাষা ও দেশের নাম যথাক্রমে 'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' হলেও মিরপুরের বাংলা কলেজ এখনও 'বাঙলা কলেজ' লেখে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগও নাকি এখনও 'বাঙলা বিভাগ' লেখে, অধ্যাপক ডক্টর হুমায়ুন আজাদও তার লেখায় 'বাঙলা' ও 'বাঙলাদেশ' লিখতেন। বাংলাকে এককালে বাঙলাই লেখা হতো। বাঙ্গালা থেকে বাঙলা, বাঙলা থেকে বাংলার উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছন্দ মেলানোর প্রয়োজনে একটি কবিতায় 'বাংলা' বানানটি ব্যবহার করেছিলেন। 'বাংলা' শব্দটির ব্যাখ্যা হিশেবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন–

'ঙ্গ' অক্ষরটি যুক্ত অক্ষর– উহার পুরা আওয়াজটি আদায় করিতে হইলে এক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। সেটা আমার ছন্দের পক্ষে যদি আবশ্যক হয় তো ভালোই; যদি না হয়, তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আওয়াজের পরিচয়, শব্দতত্ত্বের নহে। সেটা বিশেষ করিয়া অনুভব করা যায় ছন্দরচনায়। শব্দতত্ত্ব অনুসারে লিখিব এক, আর ব্যবহার অনুসারে উচ্চারণ করিব আর; এটা ছন্দ পড়িবার পক্ষে বড়ো অসুবিধা। যেখানে যুক্ত অক্ষরেই ছন্দের আকাঙ্ক্ষা, সেখানে যুক্ত অক্ষর লিখিলে পড়িবার সময় পাঠকের কোনো সংশয় থাকে না।

যদি লেখা যায়– 'বাঙ্গলা দেশে জন্মেছ বলে বাঙ্গালি নহ তুমি; সন্তান হইতে সাধনা করিলে লভিবে জন্মভূমি', তবে অমি পাঠকের নিকট 'ঙ্গ' যুক্ত-অক্ষরের পুরা আওয়াজ দাবি করিব। অর্থাৎ এখানে মাত্রাগণনায় বাঙ্গলা শব্দ হইতে চার মাত্রার হিসাব চাই। কিন্তু যখন লিখিব 'বাংলার মাটি বাংলার জল', তখন উক্ত বানানের দ্বারা কবির এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় যে 'বাংলা' শব্দের উপর পাঠক যেন তিন মাত্রার অতিরিক্ত নিশ্বাস খরচ না করেন। 'বাঙ্গলার মাটি' যথারীতি পড়িলে এইখানে ছন্দ মাটি হয়।

অতএব, বাংলা ও বাঙলা দুটোই শুদ্ধ। এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

আমার দুইটা বুক বেরিয়েছে

যারা ইংরেজি বর্ণে বাংলা লেখে; তাদের একটা বদ অভ্যেস হচ্ছে বাংলা কথার মধ্যে বেহুদা একটা ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া, যে শব্দটা তারা মৌখিক কথোপকথনে আদৌ ব্যবহার করে না। কেবল লেখার সময়েই তাদেরকে এই ডায়রিয়ায় ধরে, যেমন–

১. নানাবাড়িতে এসেছি ম্যাঙ্গো খেতে।
২. সে আমাকে কোনো কিছু আস্ক করেনি।
৩. এ ব্যাপারে অনেক থিংক করে দেখলাম।
৪. বয়টা আমাকে অনেক লাভ করে।
৫. আমার অনেক হেয়ার পড়ে যাচ্ছে।
৬. ফিশ কাটতে গিয়ে আমার ফিঙ্গার কেটে গেছে।
৭. তোমার মুখে টিথ কয়টা?
৮. আজ পটেটো ভর্তা বানিয়েছি, এগ ভেজেছি।
৯. ওর তো নোজ ধরে টিপ দিলে মিল্ক বেরোবে!

এসব অপদার্থকে নিয়ে ইয়াম্মি সিরিজ শীর্ষক ডজন-ডজন ছড়াও লিখেছি এককালে। ব্যক্তিগত বায়ুবদল আর মেজাজের আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এখন আর ওসব লেখা হয় না। বইমেলা এলেই অবশ্য এ রকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি প্রায়ই হতে হয়–

১. ব্রো, এবার আপনার কয়টা বুক বেরিয়েছে?
২. আপনার বুকগুলো কি ঢাকার বাইরে পাওয়া যাবে?
৩. আপনার বুক দুটোর দাম কত?

বাংরেজিতে বই লিখতে লাগে তিন বর্ণ আর ইংরেজিতে বুক লিখতে লাগে চার বর্ণ। এর পরও এই নির্বোধের পাল বাংলা বাক্যে 'বই'-এর পরিবর্তে 'বুক' লিখবেই। কী করে এই হাঁদারামদেরকে বোঝাই– পুরুষের বুক বেরোয় না, পুরুষের বুকের কোনো দামও নেই, পুরুষের বুক অমূল্য অথবা মূল্যহীন।

সাত-আট বছর আগে যখন আটচল্লিশ পৃষ্ঠার বই বের করতাম, তখন শুনতে হতো– 'আপনার বুক এত পাতলা কেন'। আর এ বছর শুনতে হয়েছে– 'ব্রো, আপনার বুক দুটো তো একই সাইজের; একটার দাম পঞ্চাশ টাকা বেশি কেন?' এই লোমহর্ষক প্রশ্ন শুনে বেশ চিন্তিত হয়েছি, বারবার ঢোক গিলেছি, অপরাধবোধেও ভুগেছি। কথা তো ঠিকই, একই ব্যক্তির দুটো বুকের রেট কোনোভাবেই দু-রকম হতে পারে না। একটি বা তিনটি বই বেরোলে সমস্যা হয় না। যে-বছর দুটো বই বের হয়, সে বছর আমি খুব আতঙ্কিত বোধ করি, ভুগি অকথ্য অস্তিত্ব-সংকটে। কারণ 'এবার আপনার কয়টি বুক বেরিয়েছে' প্রশ্নের জবাবে সে-বছর মুখ ফসকে বলে ফেলতে হয়– এবার আমার দুইটা বুক বেরিয়েছে!

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মানসিক–মানুষিক

'মানুষ' শব্দের বিশেষণ হচ্ছে 'মানুষিক'।

যেমন– অমানুষিক অত্যাচার (যে অত্যাচার মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব), অমানুষিক পরিশ্রম (যে পরিশ্রম মানুষের পক্ষে অসম্ভব)।

আর 'মন'-এর বিশেষণ হচ্ছে 'মানসিক'।

যেমন– মানসিক রোগ, মানসিক চাপ, মানসিক নির্যাতন (মনের ওপর যে নির্যাতন), মানসিক যন্ত্রণা, মানসিক দক্ষতা, মানসিক কষ্ট।

অমানষিক কিংবা অমানুসিক বলে কোনো শব্দ নেই।

মার্কিন–জার্মান

'মার্কিন' শব্দটি 'আমেরিকান' শব্দের অপভ্রংশ। মার্কিন মানেই আমেরিকান, আমেরিকান মানেই মার্কিন। 'মার্কিনি' বলে কোনো শব্দ নেই। 'মার্কিনি চক্রান্ত' না বলে বলতে হবে 'মার্কিন চক্রান্ত'। 'মার্কিনিরা ভোজনপ্রিয়' না বলে বলতে হবে 'মার্কিনরা ভোজনপ্রিয়'।

জার্মানি একটি দেশের নাম, জার্মান সে দেশের ভাষার নাম, সে দেশের নাগরিকদেরকেও জার্মান বলা হয়। 'তিনি জার্মান থাকেন' না বলে বলতে হবে 'তিনি জার্মানিতে থাকেন'। 'জার্মান-ইতালি ম্যাচ' না বলে বলতে হবে 'জার্মানি-ইতালি ম্যাচ'।

ভিআইপি

অনেকেই 'ভিআইপি পার্সন' বা 'ভিআইপি ব্যক্তি' কথাটা ব্যবহার করে থাকেন। ভিআইপি মানে ভেরি ইম্পরট্যান্ট পার্সন। তা হলে 'ভিআইপি পার্সন' কথাটার অর্থ দাঁড়ায় 'ভেরি ইম্পরট্যান্ট পার্সন পার্সন'! অর্থাৎ 'ভিআইপি পার্সন' না বলে শুধু 'ভিআইপি' বলতে হবে। যেমন–

ভিআইপিদের যাতায়াতের কারণে আজ যানজট ছিল।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার-সহ অনেক ভিআইপি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন–সংঘটন

সংগঠন = প্রতিষ্ঠান
সংঘটন = ঘটানো
যেমন–
খেলাঘর একটি শিশু-কিশোর সংগঠন।
উদীচী একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।
ছায়ানট একটি অরাজনৈতিক সংগঠন।
গুলিস্তানে অপরাধ সংঘটনের পরিমাণ বেড়ে গেছে।
একাত্তরে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের জন্য রাজাকারদের বিচার হচ্ছে।
সংগঠিত = ঐক্যবদ্ধ বা একই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত
সংঘটিত = ঘটে গেছে এমন
যেমন–
তাজউদ্দিন আহমেদ একাত্তরে গোটা জাতিকে সংগঠিত করেছিলেন।
রুমি-আজাদদের সংগঠিত ক্র্যাক প্লাটুন মুক্তিযুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছিল।
সালাম-বরকতরা ছাত্রদেরকে সংগঠিত করে একুশে ফেব্রুয়ারি মিছিল করেছিলেন।
আজ সকালে মুনশিগঞ্জে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।
শরিয়তপুরে সংঘটিত একটি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দশজন।
একাত্তরে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীহত্যার জন্য নিজামির ফাঁসি হয়েছে।

কারণ– কেননা

'কারণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ইতিবাচক বাক্যে।
আর 'কেননা' নেতিবাচক বাক্যে (অর্থাৎ যেসব বাক্যের প্রথমাংশে ক্রিয়াপদের পরে না/নি/নাই আছে)।
যেমন–
রহিম মুক্তি পেয়েছে, কারণ সে নিরপরাধ।
করিম মুক্তি পায়নি, কেননা সে অপরাধী।
বাংলাদেশ গতকাল জিতেছে, কারণ বোলিং-ব্যাটিং ভালো ছিল।

বাংলাদেশ আজ জিতবে না, কেননা আজ বোলিং-ব্যাটিং ভালো হচ্ছে না।
আজ কবিতা লিখব, কারণ আজ মন ভালো।
গতকাল কবিতা লিখিনি, কেননা গতকাল মন খারাপ ছিল।

সবান্ধব-সপরিবার-সহৃদয়

সবান্ধব, সপরিবার, সশরীর, সহৃদয়– এসব শব্দে 'স' মানে সহ/সহিত। সবান্ধব মানে বান্ধবসহ, সপরিবার মানে পরিবারসহ, সশরীর মানে শরীরসহ, সহৃদয় মানে হৃদয়বান। 'আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত' মানে 'আপনি বান্ধবসহ আমন্ত্রিত'। আবার 'তিনি সপরিবার সেখানে গিয়েছিলেন' মানে 'তিনি পরিবারসহ সেখানে গিয়েছিলেন।' তেমনিভাবে 'আদালত তাকে সশরীর উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে' কথাটার মানে হলো– আদালত নির্দেশ দিয়েছে যেন সে নিজে উপস্থিত থাকে, তার পক্ষে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে চলবে না, ভিডিওকলে হাজিরা দিলেও চলবে না। আর সহৃদয় মানে যার হৃদয় আছে, অর্থাৎ দয়ামায়া আছে।

উল্লিখিত শব্দগুলোয় (সবান্ধব, সপরিবার, সশরীর, সহৃদয়) স-এর জায়গায় স্ব ব্যবহার করা যাবে না, প্রথম তিনটিতে র-এ এ-কারও দেওয়া যাবে না। সহৃদয়-কে সহৃদয়বান লেখা যাবে না। কেননা 'সহৃদয় ব্যক্তি' মানেই 'হৃদয়বান ব্যক্তি'।

বাধ-বাঁধ বাধা-বাঁধা

বাধ আর বাঁধ এক না। বাধ মানে ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধকতা। আর বাঁধ মানে 'জলপ্রবাহ রোধকল্পে নির্মিত প্রাচীর'। ফলে কাপ্তাই বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ, টিপাই বাঁধ– এইসব বাঁধে চন্দ্রবিন্দু আছে।

চন্দ্রবিন্দু ছাড়া 'বাধা' মানে বিঘ্ন, কষ্ট বোধ হওয়া, আটকানো। যেমন–

বাধা আসবে যেখানে, লড়াই হবে সেখানে।
এমনটা বলতে তোমার একটুও বাধল না?
হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ কাঁটায় বেধে গিয়েছি।
মা, তুমি আমার পথে বাধ সেধো না।
বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

চন্দ্রবিন্দু-সহ 'বাঁধা' মানে আবদ্ধ করা, রচনা করা, গ্রন্থিত করা; নির্দিষ্ট বা পাকা করা হয়েছে– এমন, অপরিবর্তনীয়, ঋণের জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখা, বন্ধক রাখা ইত্যাদি। যেমন–

তোমায় নিয়ে বেঁধেছি গো সুখেরই স্বপন।
তোমায় নিয়ে বাঁধব ভালোবাসার ঘর।
সোহাগে-আদরে বেঁধেছি তোমারে।
শিগগিরই ওরা সাতপাকে বাঁধা পড়তে যাচ্ছে।
তিনি কথায়-কথায় গান বাঁধতে পারেন।

'বাধানো' মানে ঘটানো, যেমন–
ঝামেলা বাধিয়ো না।
সর্দি-জ্বর বাধার আর সময় পেল না!
মহিলা পেট বাধিয়েছে।

আর 'বাঁধানো' মানে বাঁধাই করা। যেমন–
শান-বাঁধানো ঘাট।
এখানে ছবি বাঁধাই করা হয়।
কথাগুলো সোনার হরফে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

বর্ণমালা

অবহেলা ও আঞ্চলিকতাদোষের কারণে অনেকেই পঞ্চাশটা বাংলা বর্ণের নাম শুদ্ধভাবে বলতে পারে না, যেমন– বরিকেজ্-জ, উমো, নিয়ো, দৈন্তেশ্-স, তালেবেশ্যা, প্যাটকাডা মৈদ্দেনেশ্-শ, কান্দেবাড়ি-ধ ইত্যাদি। কয়েকটি বাংলা বর্ণের প্রকৃত নাম এখানে উল্লেখ করছি–

অ = স্বরে অ
আ = স্বরে আ
ঙ = উঁয়ো
জ = বর্গীয় জ
ঞ = ইঁয়ো
ণ = মূর্ধন্য ণ
ন = দন্ত্য ন
য = অন্তঃস্থ য
য় = অন্তঃস্থ অ
শ = তালব্য শ
ষ = মূর্ধন্য ষ
স = দন্ত্য স

এ ছাড়া; তিনটি পরাশ্রয়ী বর্ণের নাম অনুস্বর, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু।

বলির পাঁঠা

ক্যামেরাম্যান, চেয়ারম্যান, ব্যাটসম্যান– শব্দগুলো এককালে ছিল নিত্য পুরুষবাচক। একটা সময় ছিল যখন কোনো নারী ক্যামেরা ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করেননি। নারীরা চেয়ারম্যান পদে বসা শুরু করেছেন বেশিদিন হয়নি। নারীরা ক্রিকেট খেলাও শুরু করেছেন মাত্র সম্প্রতি। ফলে এই শব্দগুলোর লিঙ্গনিরপেক্ষ রূপ আগে প্রয়োজন পড়েনি, এখন প্রয়োজন পড়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যামেরাম্যান এখন ক্যামেরাপার্সন বা ক্যামেরা ক্রু, চেয়ারম্যান এখন চেয়ারপার্সন বা শুধুই চেয়ার, ব্যাটসম্যান এখন ব্যাটার। অবশ্য ম্যানহোল শব্দটাকে এখনও কেউ পার্সনহোল বা উইম্যানহোল করার দাবি তোলেননি। কেন তোলেননি– ভাবার বিষয়। পৃথিবী থেকে পুরুষতন্ত্র একদিন হয়তো চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, পুরুষতন্ত্র থেকে যাবে শুধুই ম্যানহোলে। পৃথিবীকে শতভাগ পুরুষতন্ত্রমুক্ত করতে ম্যানহোলে নজর দিতে হবে।

এডওয়ার্ড সাইদ ও মিশেল ফুকোর লেখা চুরির অভিযোগে চার বছরের তদন্ত শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সামিয়া রহমান ও সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুল হক মারজানকে পদাবনতি দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। সামিয়া অবশ্য সাংবাদিকসম্মেলন ডেকে সম্প্রতি দাবি করেছেন তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার এবং বলির পাঁঠা। সামিয়া ষড়যন্ত্রের শিকার, নাকি প্রতিপক্ষ তার স্বরযন্ত্রের শিকার– সেটি জানা বা বোঝা দুই টাকার ছা-পোষা লেখক বা ছয় টাকার চা-পোষা কবিদের কাজ না। ধরেই নেওয়া যাক সামিয়া ষড়যন্ত্রের শিকার, কিন্তু তিনি বলির পাঁঠা– এ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মারজান নিজেকে বলির পাঁঠা বললে মানা যেত, সামিয়ার পক্ষে পাঁঠা হওয়া সম্ভব না। চেয়ারম্যান, ব্যাটসম্যান, ম্যানহোলের মতো কেবল ইংরেজি শব্দগুলোই পুরুষতান্ত্রিক না; বাংলা গালি বা বাংলা বাগধারাগুলোও প্রচণ্ড রকমের পুরুষতান্ত্রিক। বাংলা বাগধারার ওপর থেকে পুরুষতন্ত্রের ভূত তাড়াতে হবে, কায়েম করতে হবে মানবিকতা, জারি

রাখতে হবে লিঙ্গনিরপেক্ষতা। বলির পাঁঠা বাগধারার লিঙ্গনিরপেক্ষ সংস্করণ তৈরির জন্য বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসা দরকার এবং সামিয়া রহমানদের উচিত বলির পাঁঠার নবনির্মিত সংস্করণ ব্যবহার করা। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে প্রধান করে এই 'বলির পাঁঠা সংশোধন কমিটি' গঠন করা যেতে পারে।

কী হতে পারে বলির পাঁঠার লিঙ্গনিরপেক্ষ রূপ? কী বা হতে পারে বলির পাঁঠার নারী সংস্করণ?

ম্যানহোল-পার্সনহোল

বাংলা ভাষার একমাত্র আসল কবি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আশির দশকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ঘোষণা করলেন– বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কোনো ইংরেজি শব্দ থাকবে না এবং সে-মতে ভাষাবিদদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন প্রচলিত ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবনের। তৎকালীন ভাষাবিদগণ বেশ কিছু প্রচলিত ইংরেজি শব্দের বাংলা বানালেন; যেমন– তারা সফটওয়্যারের বাংলা বানালেন 'কোমলসম্ভার', হার্ডওয়্যারের বাংলা বানালেন 'শক্তসম্ভার'। ভাগ্যিস তারা আন্ডারওয়্যারে হাত দেননি, দিলে এখন আন্ডারওয়্যারকে বলতে হতো 'নিম্নসম্ভার'। দাঁতের নিরাপত্তার কথা ভেবে মানুষ এরশাদীয় বাংলা গ্রহণ করেনি, বরং প্রচলিত ইংরেজি শব্দগুলো ইংরেজিতেই বলেছে।

আমাদের কারওয়ানবাজারের প্রথম আলো পত্রিকাও ভাষার ব্যাপারে অনেকটা এরশাদীয় মাজহাবে বিশ্বাসী। প্রথম আলোও প্রায়শই প্রচলিত ও জনপ্রিয় কিছু ইংরেজি শব্দের অহেতুক-অপ্রয়োজনীয় ও হাস্যস্পদ বাংলা বানিয়ে থাকে; যেমন– প্রথম আলো রেডিও জকির বাংলা বানিয়েছে কথাবন্ধু, এসএমএসের বাংলা বানিয়েছে ক্ষুদে বার্তা। যেসব ইংরেজি শব্দ আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথোপথনে ব্যবহারে সদা-অভ্যস্ত; পত্রিকার পাতায় সেসব শব্দের অহেতুক অনুবাদ কেবল অ্যালার্জি-উদ্রেককারী নয়, হাস্যকরও বটে।

'সেলফি' শব্দটি ইদানীং সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। উৎপত্তি ইংরেজি ভাষা থেকে হলেও শব্দটি এখন কেবল ইংরেজি ভাষার একক সম্পত্তি নয়, শব্দটি এখন বিশ্বজনীনও বটে। কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার দাদারা সেলফির বাংলা বানিয়েছেন 'নিজস্বী'। এ-জাতীয় অপ্রয়োজনীয় অনুবাদ দেখলে নিরেট বেরসিক ব্যক্তিটিও পুরো এক মিনিট না হলেও এক মিনিটের অন্তত আদ্ধেকটা সময়-জুড়ে হাসবেন। এমনকি 'অ্যাকাডেমি' শব্দের বাংলা

খুঁজে না পেয়ে কোলকাতার দাদারা অ্যাকাডেমিকে লেখেন 'আকাদেমি', আকাদেমিতে নাকি একটু বাংলা-বাংলা স্বাদ পাওয়া যায়। আমাদের সেগুনবাগিচা থেকে কাকরাইল যাওয়ার পথে একটি সাইনবোর্ড দেখা যায়, তাতে লেখা 'ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইবুনাল'। প্রশ্ন হচ্ছে– কেউ যদি ইংরেজি 'ট্যাক্স'কে গ্রহণ করতে পারে, ইংরেজি 'ট্রাইবুনাল'কে গ্রহণ করতে পারে; তাহলে 'আপিলেট' বা 'অ্যাপিলেট'কে কেন খামোখা বিকৃত করে 'আপিলাত' করা, বাপু? অ্যাকাডেমি বা অ্যাপিলেট শব্দদ্বয় কি এতই আপত্তিকর?

আজ আইন বিভাগের ঈষৎ অনুজ এক বন্ধু আনন্দবাজারের অনুবাদকাণ্ডের কথা জানিয়ে আমার কাছে 'স্মার্টফোন'-এর বাংলা জানতে চাইলে বেশ বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম, ভরা মজলিশে ভাষাগত প্রশ্নে আমাকে বিপদে ফেলতে পেরে বন্ধুটি বেশ পুলকিত বোধ করছিল। একবার মনে করলাম ওকে বলি প্রথম আলো বা আনন্দবাজারে ফোন করে স্মার্টফোনের বাংলা জিজ্ঞেস করতে বা গুলশানে গিয়ে এরশাদকে ধরতে। কষ্টেসৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ভেবেচিন্তে স্মার্টফোনের বাংলা বানালাম 'চটপটে দূরালাপনী'। ইয়াম্মি চেহারার কোনো কন্যে দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে 'অ্যাই যে ভাইয়া, আপনাদের এখানে ভালো চটপটে দূরালাপনী আছে?'– দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখলে ম্যাজমেজে শরীরটাও চট করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ভাগ্যিস ঈষৎ অনুজ বন্ধুটি আমার কাছে হটডগ, ফাস্ট ফুড, চুইং গাম, ল্যাপটপ, ইনবক্স, মিসড কল, ম্যানহোল ইত্যাদি শব্দের বাংলা জানতে চায়নি। জানতে চাইলে আমাকে এগুলোর বাংলা বলতে হতো যথাক্রমে গরমকুত্তা, দ্রুতখাদ্য, চর্ব্য আঠা, কোলচূড়া, মধ্যবাকশো, ছুটে যাওয়া আহ্বান ও মানবগর্ত। ভাগ্যিস আমাদের জিহ্বার স্বাধীনতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, মতিউর রহমান বা অভীক সরকারের (আনন্দবাজারের সম্পাদক) হাতে বন্দি না, নইলে ম্যানহোলকে আমাদের বলতে হতো 'মানবগর্ত'। ইদানীং আবার পুরুষতান্ত্রিক শব্দগুচ্ছের লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দ প্রচলনের জোর দাবি উঠছে, যেমন : চেয়ারম্যানকে চেয়ারপার্সন, ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরাপার্সন ইত্যাদি। ভাগ্যিস ম্যানহোলের ওপর ওনাদের নজর পড়েনি, পড়ে গেলে

ম্যানহোলকে লিখতে হতো 'পার্সনহোল'– ভাবতেই গা কেমন যেন শিউরে ওঠে।

যা হোক, ভাষা কোনো বদ্ধ কুয়ো না, বরং বহতা নদী। এক নদীর জল আরেক নদীতে মিশবেই, বাঁধ দিয়ে এক ভাষার শব্দের অন্য ভাষায় প্রবেশ বন্ধ করা যাবে না। যেসব শব্দের প্রচলিত ও জনপ্রিয় বাংলা আছে, সেসব শব্দের অহেতুক বিদেশী প্রতিশব্দের ব্যবহার যেমন আপত্তিকর; তেমনি যেসব প্রচলিত ও জনপ্রিয় বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই, সেসব ক্ষেত্রে আনন্দবাজার বা কারওয়ানবাজার থেকে জোর করে বিদঘুটে বাংলা প্রতিশব্দ আমদানি করাও আপত্তিকর। বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দের অর্ধেকের বেশি বিদেশী। বিদেশী শব্দের আত্মীকরণে আমরা কৃপণ নই, বরং আকাশের মতো উদার। উৎকট-উদ্ভট আনন্দবাজারি-কারওয়ানবাজারি বাংলা অনুবাদ গেলার চেয়ে প্রচলিত শ্রুতিমধুর বিদেশী শব্দের সুধাপানই অধিক সুখদায়ক।

৭ নভেম্বর ২০১৪

প্রসঙ্গ : কুমিল্লা

চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়ক ধরে ঢাকায় ফিরতে-ফিরতে কুমিল্লা অতিক্রম করতে-করতে একটা প্রলাপ বকে যাই– ব্রিটিশরা কুমিল্লার বানান যে Comilla বানিয়েছিল, সেটা মন্দের ভালো ছিল। উপমহাদেশের আরো অনেক জায়গার নামের বানানই ওরা ওদের সুবিধাজনকভাবে বানিয়ে নিয়েছিল।

সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জেলার নামের ব্রিটিশ বানান বদলানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুমিল্লার পরিবর্তিত বানানটি (Cumilla) সর্বাধিক উদ্ভট হয়েছে। এই Cumilla-র সম্ভাব্য উচ্চারণগুলো দাঁড়ায় কিউমিল্লা, কামিল্লা কিংবা চিউমিল্লা; এর উচ্চারণ কোনোভাবেই 'কুমিল্লা' না। যদি Comilla পালটাতেই হয়, তা হলে কুমিল্লার একমাত্র বানান হতে হবে Kumilla। কুমিল্লার বানান Kumilla ছাড়া আরকিছু হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। বাংলা ক-এর ইংরেজি প্রতিবর্ণ k, কোনোভাবেই c না। কুড়িগ্রামকে যেহেতু Curigram কিংবা কুষ্টিয়াকে যেহেতু Cushtia লেখার সুযোগ নেই, পরিবর্তিত বানানে সেহেতু কুমিল্লাকেও Cumilla লেখার সুযোগ নেই।

ঢাকা এককালে Dacca ছিল, কোলকাতা ছিল Calcutta। ঢাকা এখন Dhaka হয়েছে, কোলকাতা হয়েছে Kolkata। অর্থাৎ দুই শহরই ক-এর প্রতিবর্ণ হিশেবে c বর্জন করে k বেছে নিয়েছে। তা হলে শুধু কুমিল্লার ক্ষেত্রেই c কেন? c-এর সাথে কুমিল্লার কিসের এত সম্পর্ক? c-এর মধ্যে কী আছে, যা k-এর মধ্যে নেই?

কুমিল্লাকে Cumilla বানালেন কারা? তাদের পরিচয় কী? তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? প্রতিবর্ণীকরণের ন্যূনতম যোগ্যতা তাদের আছে কি না? একটা জেলার নামের বানান পরিবর্তনে যে শত-শত কোটি টাকা খরচ হয়, কুমিল্লার জনগণ সেই টাকাটার এমন শ্রাদ্ধ হতে দিলেন কেন? আরো একবার বানান বদলে আবার শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া যাবে– এই আশা থেকেই কুমিল্লাকে Cumilla করা হয়নি তো?

৬ মার্চ ২০২২

আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি

আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি– 'শহিদদিবস' বা অধুনা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস'। দিবসটিকে কেন্দ্র করে এখন নিশ্চয়ই অনেকে অনেক কিছু লিখবেন এবং সেই লেখায় বিস্তর বানানভুলও থাকবে। শহিদদিবস-কেন্দ্রিক লেখাগুলোয় যে যে বানানভুল ঘটে থাকে, সে ব্যাপারে আগে থেকেই সতর্ক করে দিচ্ছি–

১. শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রভাতফেরি বানানে হ্রস্ব ই-কার। পুষ্প বানানে মূর্ধন্য ষ।

২. বিদেশী শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার হয় না বিধায় ফেব্রুয়ারি, শহিদ ইত্যাদি বানানেও ই-কার। বাংলা অ্যাকাডেমির অনেক অভিধানে 'শহীদ' লেখা থাকলেও বাংলা অ্যাকাডেমির নিয়ম মোতাবেকই বানানটি 'শহিদ' হতে হবে।

৩. সমাসবদ্ধ পদ একসাথে বসে, মাঝে স্পেস বা ফাঁকা থাকবে না। শহিদদিবস, শহিদমিনার, ভাষাশহিদ, প্রভাতফেরি, মাতৃভাষা-দিবস ইত্যাদি পদগুলো সমাসবদ্ধ বলে শব্দগুলোয় স্পেস হবে না; একসাথে বসবে বা মাঝে হাইফেন ব্যবহার করতে হবে।

৪. 'সকল ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি' কথাটা ভুল, এটি বাহুল্যদোষে দুষ্ট। কথাটা হবে 'সকল ভাষাশহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি'।

৫. 'ভাষাশহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধা'– এখানে শব্দটা 'উদ্দেশ্যে' না হয়ে 'উদ্দেশে' হবে। 'উদ্দেশ্য' মানে লক্ষ্য, 'উদ্দেশ' মানে দিকে বা প্রতি।

৬. ভাষাশহিদ ও ভাষাসৈনিক ব্যাপার দুটো আলাদা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা ভাষাশহিদ; যারা লড়াইয়ে অংশ নিলেও শহিদ হননি, তারা ভাষাসৈনিক।

৭. অনেকেই ভুল করে 'শুভ শহিদদিবস', 'হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল

মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে', 'সবাইকে শহিদদিবসের শুভেচ্ছা' ইত্যাদি লিখে ফেলবেন। বস্তুত শহিদদিবস বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস কোনো শুভ দিন না, এটি শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিনও না; দিনটি নিতান্তই শোকের, মুখ কাঁদো-কাঁদো করে জোরপূর্বক মুখে শোকের ছাপ ফুটিয়ে তোলা জরুরি না হলেও এই দিনে অন্তত শুভেচ্ছা-বিনিময়টা বন্ধ রাখতে হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

খ্রিষ্টাব্দ

আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, বাংলা বছর নামে আলাদা একটা বছর আছে। কোনো ভাষার নামে স্বতন্ত্র বর্ষপদ্ধতি থাকাটা বেশ বিরল। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর হিজরি সালের সাথে মিল রেখে যে ফসলি সনের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, সেটিকেই আমরা বাংলা বছর বলে জানি এবং বাংলা বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনটিকে আমরা বাংলা নববর্ষ বলে অভিহিত করি। হিন্দি নববর্ষ, উর্দু নববর্ষ কিংবা তামিল নববর্ষ বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ইংরেজি বছর বা আরবি বছর বলে যা আমরা জানি, তা আসলে অশুদ্ধ। ইংরেজি সাল বলে আদতে কোনো সাল নেই, এটি খ্রিষ্টাব্দ। যিশু খ্রিষ্ট বা নবি হজরত ইসাকে (আ) কেন্দ্র করে এই খ্রিষ্টাব্দ বা ইসায়ি সনের সূত্রপাত, এর সাথে ইংরেজির কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে ইংরেজি নববর্ষ বলেও কিছু নেই, এটি খ্রিষ্টীয় নববর্ষ। তারিখের শেষে অনেকে যে 'ইং' লেখেন, সেটিও ভুল ও নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আরবি বছর বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, এটি হিজরি বছর। মক্কা থেকে মদিনায় হজরত মুহাম্মদের (সা) হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যে চান্দ্র সাল প্রবর্তিত হয়েছিল; সেটি আরবি সাল না, হিজরি সাল। এর সাথে হিজরতের সম্পর্ক আছে, আরবি বা আরবের না। ফলে আরবি নববর্ষ বলেও কিছু নেই, আছে হিজরি নববর্ষ।

দাঁড়ায়ে, বানায়ে, শুনায়ে

বলার সময়ে আমরা যেকোনোভাবে যা-কিছু বলতে পারি। প্রমিত ভাষায় বলতে পারি, আঞ্চলিক ভাষায় বলতে পারি; চাইলে প্রমিত-আঞ্চলিক, সাধু-চলিত, বাংলা-ইংরেজি মিশিয়েও বলতে পারি। সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু লেখার ব্যাপারে, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মতো প্রকাশ্য ময়দানে লেখার সময়ে, বোধহয় প্রমিত ভাষা ব্যবহারই কাম্য।

কয়েক বছর ধরে বাংলা ক্রিয়াপদে অদ্ভুত একটা বিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন–

১. তোমার জন্য 'দাঁড়াই' (দাঁড়িয়ে) ছিলাম।
২. পরীক্ষায় 'বানায় বানায়' (বানিয়ে বানিয়ে) লিখেছি।
৩. ওর হাতে ব্যাগ 'ধরায়' (ধরিয়ে) দিয়ে 'দৌড়ায়ে' (দৌড়ে) বাসায় 'পালায়' (পালিয়ে) এসেছি।
৪. সে বিরক্ত 'হই' (হয়ে) গেছে।
৫. পরের ম্যাচে ভারতকে 'খায়ে' (খেয়ে) দেবো।
৬. কে আমার কপালে টিপ 'পরায়ে' (পরিয়ে) দেবে?
৭. আব্বাকে 'শুনায়ে শুনায়ে' (শুনিয়ে শুনিয়ে) পড়তে লাগলাম।

ভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু উল্লিখিত পরিবর্তনটি পরিবর্তন না, নিছক ফাজলামো। বলার সময়ে বললেও লেখার সময়ে এই ফাজলামোটা না করলেই ভালো। বিশেষত ফেসবুকে যাদের সিকি মিলিয়ন পাঠক আছে, যারা নিজেদেরকে দাবি করেন লেখক হিশেবে; তাদের পোস্টে এ জাতীয় উদ্ভট ক্রিয়াপদের উপস্থিতি রীতিমতো ক্ষমার অযোগ্য। ফেসবুকে এসব অযাচিত ভাইরাস ছড়ানো থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। সবার সচেষ্ট হওয়া উচিত ক্রিয়াপদ-সহ সব পদকে আপদমুক্ত রাখতে। কথ্য ভাষা যেমন-তেমন হোক, অন্তত লেখ্য ভাষা অকথ্য নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকুক।

১৪ নভেম্বর ২০১৬

আমিও টুকটাক লিখি

একজন লেখকের 'আমি টুকটাক লিখি' কিংবা 'এই ছাইপাঁশ লিখি-টিখি আর কী' বলা অনুচিত। কোনো লেখাই টুকটাক না। লেখা কখনও টুকটাক হয় না, কারো পক্ষে টুকটাক লেখালিখি সম্ভব না। একজন ব্যক্তি হয় লিখবেন অথবা আদৌ লিখবেন না। লেখা ও না-লেখার মাঝামাঝি কোনো স্থান নেই, টুকটাক লেখার কোনো সুযোগ নেই, লেখার অস্তিত্ব থাকলেও টেখার কোনো অস্তিত্ব নেই। লেখক লেখকই; হাফ-লেখক, সেমি-লেখক বা সিকি-লেখক হওয়ার সুযোগ নেই। না-ঘরকা না-ঘাটকা সম্প্রদায়ের আধো-লেখকরা বিপজ্জনকও বটে।

নিজের লেখাকে ছাইপাঁশ বলার মধ্যে কোনো বিনয় নেই; বরং আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে, মেরুদণ্ডহীনতার প্রকাশ আছে। লেখা যদি ছাইপাঁশই হয়, তবে তা না লিখে অন্য কাজে পূর্ণসময় ব্যয় করাই শ্রেয়। নিজের লেখার প্রতি আত্মবিশ্বাস না থাকলে লেখার পেছনে সময়, শ্রম ও মেধা খরচ নেহায়েতই নিরর্থক। যে কাজে আত্মবিশ্বাস নেই; সে কাজের পেছনে এই তিনের অপচয় পরবর্তী জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, ব্যক্তিজীবনকে বিপর্যস্ত করে, ভেঙে দেয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড।

যতদিন পর্যন্ত যদি-তবে-কিন্তু ব্যতিরেকে দৃপ্তকণ্ঠে 'আমি লিখি' শব্দ দুটো উচ্চারণ করার স্পর্ধা কলিজায় না জন্মাবে, ততদিন পর্যন্ত নিজের লেখালিখির কথা প্রকাশ্যে না আনাই উত্তম।

ম্যানারিজম

প্রায়ই 'ম্যানারিজম' শব্দটার অপব্যবহার দেখি। অনেককেই 'ওর ম্যানারিজমে সমস্যা আছে' কিংবা 'ও ম্যানারিজম জানে না' বলতে শুনি, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মুখেও এমন বাক্য শুনেছি। অনেককে দেখেছি 'লোকটাকে তার পরিবার ম্যানারিজম শেখায়নি' বলে হাপিত্যেশ করতে।

ঘটনা হচ্ছে 'ম্যানার' মানে আচরণ। বাক্য তিনটে হবে ওর ম্যানারে সমস্যা আছে, ও ম্যানার জানে না এবং লোকটাকে তার পরিবার ম্যানার শেখায়নি। আর ম্যানারিজম শব্দের অর্থ সোজা বাংলায় মুদ্রাদোষ। বিরক্তিকর বা দৃষ্টিকটু একই কাজ অনবরত করতে থাকলে সেটাকে মুদ্রাদোষ বলে। জনসম্মুখে অনবরত নখ কামড়ানো, নাকের ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকোনো, কলম কামড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করা হচ্ছে ম্যানারিজম বা মুদ্রাদোষ। একই শব্দ বিনা প্রয়োজনে বারবার বলাটাও মুদ্রাদোষ, যেমন– আর বলবেন না, ভাবি! গেলাম আজকে আপনার বাজারে। আপনার সব কিছুরই চড়া দাম। আপনার মাংসের কেজি তো পাঁচশো টাকা, ভাবি!

আমার মনে হয়– ম্যানার আর ম্যানারিজমকে গুলিয়ে ফেলাটাও এক ধরনের ম্যানারিজম।

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান

আগস্টকে কেন্দ্র করে অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই কবিতাটি অনেকেই ব্যবহার করে থাকবেন এবং ভুলভালভাবে ব্যবহার করবেন। যতকাল-এর জায়গায় কেউ 'যতদিন' লিখবেন, কেউ নদীর নামগুলো এলোমেলো করে লিখবেন, নদীর নামগুলো অনেকে বানিয়ে-বানিয়েও লিখবেন, কোনো-কোনো অতিভক্ত 'শেখ মুজিবুর রহমান' না লিখে কবির কবিতা পালটে দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' কিংবা 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' লিখে বসবেন; অর্থাৎ যে যার মতো মাধুরী মিশিয়ে এই পঙ্‌ক্তি দুটোকে ব্যবহার ও অপব্যবহার করবেন অনেকেই। কিন্তু সেটি করা যাবে না। এই পোস্টে পঙ্‌ক্তিদ্বয় যেভাবে উল্লেখ করেছি, অন্নদাশঙ্কর ঠিক সেভাবে লিখে গেছেন। তিনি যেভাবে লিখে গেছেন, কোথাও ব্যবহার করলে ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে; একচুলও এদিক-ওদিক করা যাবে না। উল্লেখ্য, কবিতাটিতে তিনি কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি।

শবে কদর

ফারসি ভাষায় 'শব' মানে রাত। ফলে 'শবে কদর' মানে কদরের রাত। 'শবে কদরের রাত' বললে এর অর্থ দাঁড়ায় 'কদরের রাতের রাত।' অর্থাৎ 'শবে কদরের রাত' কথাটি ভুল (বাহুল্যদোষে দুষ্ট), শুধু 'শবে কদর' বা শুধু 'কদরের রাত' বলতে হবে। আরবি ভাষায় 'লায়লা' মানে রাত। ফলে 'লাইলাতুল কদর' মানে কদরের রাত। 'লাইলাতুল কদরের রাত' বললে এর অর্থ দাঁড়ায় 'কদরের রাতের রাত'। অর্থাৎ 'লাইলাতুল কদরের রাত' কথাটি ভুল, শুধু 'লাইলাতুল কদর' বা 'কদরের রাত' বলতে হবে।

একই কথা শবে মেরাজ বা লাইলাতুল মেরাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ বরাত-কদর-মেরাজের ক্ষেত্রে শুদ্ধ রূপগুলো হচ্ছে–

১) শবে বরাত, শবে কদর, শবে মেরাজ
২) লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল মেরাজ
৩) বরাতের রাত, কদরের রাত, মেরাজের রাত

আর অশুদ্ধ রূপগুলো হচ্ছে–

১) শবে বরাতের রাত, শবে কদরের রাত, শবে মেরাজের রাত
২) লাইলাতুল বরাতের রাত, লাইলাতুল কদরের রাত, লাইলাতুল মেরাজের রাত

বিগত শবে বরাতে দেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন সাংবাদিক (পীর হাবিবুর রহমান) ফেসবুকের একটি লেখায় লিখেছিলেন 'আজকের রাত পবিত্র লাইলাতুল শবে বরাতের রাত'। যেহেতু 'লায়লা' অর্থও রাত, আবার 'শব' অর্থও রাত; সেহেতু তার ঐ বাক্যটিতে বাংলা-আরবি-ফারসি মিলিয়ে 'রাত' কথাটি এসেছিল চারবার। অর্থাৎ যত রকমের ভুল করা সম্ভব, তত রকমের ভুলই সাংবাদিক মহোদয় ঐ বাক্যটিতে করেছিলেন। 'আজ শবে বরাত' বা 'আজ লাইলাতুল বরাত' বা 'আজ বরাতের রাত' লিখলেই যথেষ্ট হতো।

আরবি নামে বিভ্রাট-১

সাইফুল ইসলাম, আমিনুল হক, সিদ্দিকুর রহমান, আশরাফুজ্জামান, বদরুদ্দোজা, নাজমুস সাকিব ইত্যাদি আমাদের দেশে অত্যন্ত পরিচিত নাম এবং নামগুলো ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল। ভেঙে লিখলে নামগুলো দাঁড়ায় যথাক্রমে সাইফ-উল-ইসলাম, আমিন-উল-হক, সিদ্দিক-উর-রহমান, আশরাফ-উজ-জামান, বদর-উদ-দোজা ও নাজম-উস-সাকিব। এই যে মধ্যখানে উল, উর, উজ, উদ ও উস দেখা যাচ্ছে; আরবিতে এগুলো অনেকটা সংযোজক অব্যয় বা কনজাংকশনের মতো কাজ করে (যদিও এগুলো পদাশ্রিত নির্দেশক the-এর সমতুল্য)।

'সাইফ' শব্দের অর্থ তরবারি, সাইফুল ইসলাম-এর অর্থ ইসলামের তরবারি। অর্থাৎ আরবি 'উল' অব্যয়টি এখানে বাংলা 'এর' অব্যয়ের মতো কাজ করেছে। 'সাইফুল ইসলাম' নামটি পূর্ণাঙ্গ অর্থবহ, পূর্ণাঙ্গ অর্থবহ 'সাইফ' নামটিও। কিন্তু 'সাইফুল' শব্দটি একা-একা কোনো অর্থ তৈরি করতে অক্ষম। 'সাইফুল' শব্দটি নিরর্থক, অপূর্ণাঙ্গ ও ভুল। 'সাইফ'-এর পরে 'উল' যুক্ত করলে ঐ 'উল'-এর পরে আরেকটি শব্দ (যেমন– ইসলাম, হক, আলম ইত্যাদি) লাগবেই। অর্থাৎ যার নাম সাইফুল ইসলাম; তাকে 'সাইফুল ইসলাম' ডাকা যাবে, 'সাইফ'ও ডাকা যাবে, কিন্তু 'সাইফুল' ডাকা যাবে না। একইভাবে যার নাম আমিনুর রহমান; তাকে আমিনুর রহমান ডাকা যাবে, আমিনও ডাকা যাবে, কিন্তু আমিনুর ডাকা যাবে না।

বাংলাদেশী ক্রিকেটের এক আলোচিত-সমালোচিত নাম মোহাম্মদ আশরাফুল। তার নামটি যতবার উচ্চারিত হতে শুনি বা পত্রিকায় মুদ্রিত হতে দেখি, ততবার সেটি কানে লাগে এবং পোকার মতো চোখে লাগে। 'আশরাফুল' কারো নাম হতে পারে না। হতে পারে 'মোহাম্মদ আশরাফ' কিংবা 'মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম' বা 'মোহাম্মদ আশরাফুল আলম'।

'আশরাফ' শব্দটি প্রচলিত বলে কিঞ্চিৎ সংযুক্তির মাধ্যমে মোহাম্মদ আশরাফুলের নামটি সংশোধনযোগ্য। কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলামের নামটি নিয়ে এক্ষেত্রে বিপাকেই পড়তে হয়। তার নামটি ভাঙলে দাঁড়ায় ফখর-উল-ইসলাম। তাকে ব্যাকরণসম্মতভাবে ডাকতে গেলে ডাকতে হয় পুরো ফখরুল ইসলাম কিংবা শুধু ফখর (যেমন– পাকিস্তানের একজন ক্রিকেটারের নাম ফখর জামান)। ফখর শব্দটি বাংলাদেশে অপ্রচলিত বিধায় তাকে ফখরুল বলে ডাকা ছাড়া উপায়ও নেই।

একই মামলা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়েও। তার নামটি ভাঙলে দাঁড়ায় নজর-উল-ইসলাম। প্রকাশিত চিঠিপত্রে দেখেছি তৎকালীন অনেক সাহিত্যিক তাকে 'নজর' বলেই সম্বোধন করতেন, 'নজরুল' বলে নয়। অবশ্য 'নজরুল' নামটি বাঙালির মানসপটে এতটা স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে যে, নজরুলকে নতুন করে 'নজর' নামে পরিচিত করা একেবারেই অসম্ভব এবং প্রচলিত ভুল হিশেবে 'নজরুল' শব্দটিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কোনো পথও খোলা নেই। তবু জেনে রাখা ও জানিয়ে রাখা ভালো– 'নজরুল' নামটি ভুল, শুদ্ধ নামটি 'নজরুল ইসলাম' অথবা 'নজর'।

নিরুপায় হয়ে ফখরুল-নজরুলদেরকে দায়মুক্তি দেওয়া গেলেও সাইফুল-আশরাফুল, বদরুল-সদরুল, জান্নাতুল-জহিরুল, তাইজুল-হাফিজুল, এনামুল-তারিকুল, রেজাউল-শফিউল কিংবা আমিনুর-শাহিনুর, সাইদুর-ফরিদুরকে দায়মুক্তি দেওয়া যায় না। এদেরকে যথাক্রমে সাইফ, আশরাফ, বদর, সদর, জান্নাত, জহির, তাইজ, হাফিজ, এনাম, তারিক, রেজা, শফি, আমিন, শাহিন, সাইদ ও ফরিদ নামে ডাকাই বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য 'কামরুল' বলে কোনো শব্দ নেই। শব্দটি কামার, যার অর্থ চাঁদ। কামারের সাথে উল-উজ-উন ইত্যাদি যুক্ত হয়ে কামারুল ইসলাম, কামারুজ্জামান ও কামারুননেসা নাম গঠিত হয়ে থাকে; যদিও উল্লিখিত নামগুলোতে কালক্রমে ম-এর সাথে আ-কারটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এই একই ফ্যাসাদ নারীদের নামেও আছে। মেহেরুন্নেসা, খায়রুন্নেসা, বদরুন্নেসা, ফয়জুন্নেসা, শামসুন্নাহার, নুরুন্নাহার, জেবুন্নাহার নামগুলো আমাদের দেশে অত্যন্ত সাধারণ। ভেঙে লিখলে নামগুলো দাঁড়াবে যথাক্রমে মেহের-উন-নেসা, খায়ের-উন-নেসা, বদর-উন-নেসা, ফয়েজ-উন-নেসা, শামস-উন-নাহার, নুর-উন-নাহার, জেব-উন-নাহার। নামগুলোতে 'উন' নেহায়েতই একটি সংযোজক অব্যয়ের মতো কাজ করছে। এদেরকে মেহেরুন, খায়রুন, বদরুন, ফয়জুন, শামসুন, নুরুন বা জেবুন বলে ডাকার অবকাশ নেই। ডাকলে এদেরকে পূর্ণাঙ্গ নামে ডাকতে হবে অথবা যথাক্রমে মেহের, খায়ের, বদর, ফয়েজ, শামস, নুর ও জেব বলে ডাকতে হবে। এই যাত্রায় মেহের নামটা বর্তে গেলেও বাকি নামগুলো আপদ ডেকে আনে। কারণ খায়ের, বদর, ফয়েজ, শামস ও নুর পুরুষদের নামও হয়ে থাকে।

বোনাস :

জাহাঙ্গির আলম নামটি বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচলিত। জাহান ফারসি শব্দ, যার অর্থ পৃথিবী; আর জাহানগির, জাহাঁগির বা জাহাঙ্গির অর্থ পৃথিবীজয়ী। অপরদিকে আলম শব্দটি আরবি, আলম অর্থও পৃথিবী। তা হলে জাহাঙ্গির আলমের অর্থ দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীজয়ী পৃথিবী! অতএব, যার নাম জাহাঙ্গির, তার নামে আর আলম যোগ করার দরকার নেই।

৬ নভেম্বর ২০১৬

আরবি নামে বিভ্রাট-২

অনারব মুসলমানদের ভেতরে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে, প্রখর আরবিপ্রেম বিদ্যমান। বাংলাভাষী, হিন্দিভাষী, উর্দুভাষী নির্বিশেষে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা সন্তানের নাম রাখেন সাধারণত আরবি শব্দে। ইসলামের আবির্ভাব আরবে হওয়ার কারণে এবং কোরান শরিফের ভাষা আরবি হওয়ায় অনারব মুসলমানদের এই আরবিপ্রেমটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ও সহজাত। কিন্তু সন্তানের নামকরণের বেলায় অনারব মুসলমানরা প্রায়ই এমনতর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, বেড়াতে বা কাজে আরব দেশগুলোয় গেলে যা তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনায় ঠেলে দেয়। অনারব মুসলমানরা ভুলে যান– সকল আরবি শব্দই পবিত্র না, আরবি হরফখচিত কাগজ দেখলেই তাতে চুমু খাওয়ার কোনো কারণ নেই; আরবি হরফে অকথ্য গালাগালও লেখা থাকতে পারে, থাকতে পারে ধর্মবিরোধী কথাবার্তাও।

পুরুষদের নামের আগে 'আবু' বা 'আবুল' যুক্ত করার প্রবণতা এই উপমহাদেশে খুবই সাধারণ এবং ব্যাপারটা যে কতটা হাস্যকর ও অযৌক্তিক, আরবিপ্রেমের আতিশয্যে উপমহাদেশবাসী তা চিন্তা করে দেখারই সময় পান না। আমাদের দেশে আবু বকর, আবুল কালাম, আবুল বাশার প্রভৃতি নামধারী ব্যক্তি ভূরি-ভূরি আছেন; নাম তিনটির অর্থ যথাক্রমে বকরের বাবা, কালামের বাবা ও বাশারের বাবা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির পুত্রের নাম যদি হয় কালাম, কেবল তবেই তাকে 'আবুল কালাম' ডাকা যাবে; যেভাবে আমরা আমাদের দেশে 'কালাম' নামের কারো পিতাকে 'কালামের বাপ' বলে ডাকি। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির নাম জন্ম থেকেই 'আবুল কালাম' হতে পারে না, কোনো ব্যক্তি বিয়ে করে পুত্র জন্ম দিয়ে পুত্রের নাম 'কালাম' রাখলে তবেই তাকে 'আবুল কালাম' বলে ডাকার সুযোগ আছে। এই একই কথা শুরুতে আবু বা আবুল-যুক্ত সকল নামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য– ইসলামের নবি হজরত মুহাম্মদের (সা) একটি উপনাম ছিল। নবিজির অকালপ্রয়াত পুত্রের নাম ছিল কাশেম। নবিজির স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা) নবিজিকে 'কাশেমের বাবা' বলে ডাকতেন, 'কাশেমের বাবা' কথাটাকে আরবিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'আবুল কাশেম'। অর্থাৎ জন্মের পরপরই কোনো শিশুর নাম আবুল কাশেম রাখার অবকাশ নেই, কোনো ব্যক্তির ছেলের নাম 'কাশেম' হলে কেবল তবেই ঐ ব্যক্তিকে 'আবুল কাশেম' বলে ডাকা যাবে; অন্যথায় না।

উপমহাদেশের মুসলমান পুরুষরা যেমন আবুল-বিভ্রাটে আপতিত, তেমনি মুসলমান নারীরা আপতিত উম্মে-বিভ্রাটে। এ দেশে উম্মে খাদিজা, উম্মে হানি, উম্মে কুলসুম নামধারী নারী ঘরে-ঘরে মিলবে। আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে আরবিতে উম্মে মানে মা। উল্লিখিত তিনটি নামের অর্থ দাঁড়ায় যথাক্রমে খাদিজার মা, হানির মা ও কুলসুমের মা। অর্থাৎ কোনো নারীর কন্যার নাম 'কুলসুম' হলে কেবল তবেই তাকে 'উম্মে কুলসুম' বলে ডাকা সম্ভব, অন্যথায় না। নবিজির (সা) প্রথম স্ত্রী ছিলেন হজরত খাদিজা (রা), তাদের কন্যা ছিলেন হজরত ফাতেমা (রা)। নবিজি খাদিজাকে যদি 'উম্মে ফাতেমা' বা 'ফাতেমার মা' বলে ডেকে থাকেন, তা হলে সেটা যুক্তিসংগত। অর্থাৎ 'ফাতেমা' আর 'উম্মে ফাতেমা' এক জিনিশ না। জন্মের পরপরই কোনো শিশুর নাম 'উম্মে ফাতেমা' হতে পারে না। একজন নারীকে কেবল তখনই 'উম্মে ফাতেমা' ডাকা যাবে, যখন 'ফাতেমা' নামে তার একটি কন্যা থাকবে।

বাংলাদেশে অনেকেই ধরে নেন 'বিনতে' শব্দটি নিজেই একটি নাম। আসলে নারীদের নামের শেষে পিতার নামের কোনো অংশ থাকলে ঐ অংশের আগে 'বিনতে' শব্দটি থাকে। যেমন 'মনিরা বিনতে জালাল' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'জালালের মেয়ে মনিরা'। শুধু 'মনিরা বিনতে' লেখার কোনো সুযোগ নেই। লিখলে শুধু মনিরা লিখতে হবে অথবা পুরো 'মনিরা বিনতে জালাল' লিখতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য– পুত্রের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত করতে চাইলে বিন বা ইবনে ব্যবহার করতে হবে। যেমন 'তারেক বিন জালাল' বা 'তারেক ইবনে জালাল' যার অর্থ 'জালালের ছেলে তারেক'।

বাংলাদেশের সফলতম ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের স্ত্রীর নাম উম্মে আহমেদ শিশির। 'উম্মে আহমেদ'-এর অর্থ দাঁড়ায় 'আহমেদের মা', যদিও আহমেদ নামে তাদের কোনো সন্তান নেই। এই ভুলের রাজ্যে সেটি অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারও না। শিশির ফেসবুকে আছেন 'সাকিব উম্মে আল হাসান' নামে। উদ্বেগের ব্যাপার হচ্ছে 'উম্মে আল হাসান' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'আল হাসানের মা', যা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও বিব্রতকর। খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি– সাকিবপত্নী ইচ্ছে করে এই নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলেননি, এই নামটি নিশ্চয়ই তিনি না বুঝে ব্যবহার করে চলছেন। সাকিবপত্নীর সাথে বা সাকিবের সাথে কারো যোগাযোগ থাকলে অনুরোধ থাকবে এই লেখাটি তাদের যেকোনো একজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার।

যাদের নামের আগে আবু-আবুল-উম্মে আছে, তাদের অবশ্য খুব-একটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। তাদের নাম পরিবর্তনেরও দরকার নেই। ব্যাপারটি শুধু উপলব্ধি করলেই আপাতত চলবে। ভবিষ্যৎপ্রজন্মের কারো নাম রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি মাথায় রাখলেই লেখাটি সার্থক হবে এবং লেখকও বর্তে যাবেন।

৩১ অক্টোবর ২০১৬

মহাপরিচালকের বানানভুলের মহাপ্রলয়

বাংলা অ্যাকাডেমির ১৯৯৩ সালের প্রমিত বাংলা বানানের একটা নিয়ম হচ্ছে ইংরেজি a-এর উচ্চারণ বিবৃত হলে তা 'এ' দিয়ে না লিখে 'অ্যা' দিয়ে লেখা হবে; যেমন– অ্যাটম, অ্যাডভোকেট, অ্যালকোহল, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি। আরো একটি নিয়ম করা হলো এই মর্মে যে, কোনো বিদেশী শব্দে ঈ-কার বা ঈ হবে না। তাদের এই নিয়ম চালু হওয়ার দেড় দশকেরও অধিককাল-জুড়ে academy শব্দটিকে তারা 'একাডেমী' লিখে এসেছেন এবং কয়েক বছর যাবৎ তারা অবশ্য 'একাডেমী'-কে একটু বদলে 'একাডেমি' লিখছেন, যদিও তাদেরই সৃষ্ট বিধি মোতাবেক বানানটা 'অ্যাকাডেমি' হওয়ার কথা। এ নিয়ে এক দশক আগে পত্রপত্রিকায়ও লিখেছি, কোনো ফায়দা হয়নি; 'একাডেমী' বড়জোর 'একাডেমি' হয়েছে, 'একাডেমি' আর 'অ্যাকাডেমি' হয়নি। অর্থাৎ বাংলা অ্যাকাডেমি নিজেই নিজের সৃষ্ট আইন মানে না!

বাংলা অ্যাকাডেমির প্রায় প্রত্যেক কর্মকর্তাই কবি-সাহিত্যিক। এই কবিদের কয়েক জনের বন্ধুতালিকায় থাকতে পারার সুবাদে তাদের পদ্যচর্চা সম্পর্কে কিছুটা অবগত আছি এবং আবিষ্কার করেছি বাংলা বানান তাদের কাছে খুব-একটা গুরুত্ববহ কিছু না, বিনয়ের সাথে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরও তারা ভুল বানান বহাল রাখেন এবং তাদের কেউ-কেউ ভুল বানানে লিখতে পেরে খানিকটা গর্বিতও। অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানটি বাংলা বানান নির্ধারণের স্বীকৃত অভিভাবক; খোদ সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তারাই বাংলা বানানকে ভর্তা করছেন, সর্বনাশ করে ছেড়ে দিচ্ছেন বাংলা ভাষার বাপ-মাকে।

এই সর্বনাশকারীদের দলে যুক্ত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালকও। একটি প্রকাশনীকে বইমেলায় দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়ে বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান

খান ফেসবুকে একটি পোস্ট লিখেছেন কয়েক দিন আগে। প্রকাশনীটি নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনোরূপ ব্যাখ্যা না দিয়ে পোস্টটিতে এই ভদ্রলোক অপ্রাসঙ্গিকভাবে শিবের গীত গেয়েছেন, কৃষ্ণ-গণেশ-কালী প্রমুখ দেব-দেবীও তার ঐ গীত-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাননি। সেরের ওপর সোয়া সের হিশেবে ক্ষুদ্র ঐ পোস্টটিতে তিনি বানানভুলের সিকি-সেঞ্চুরি করেছেন বলে লোকমুখে শুনেছি এবং এমনকি আট-দশবার এডিট করার পরও পোস্টটিতে ডজন খানেকের অধিক ভুল রয়ে গিয়েছে!

বানানভুল নিয়ে গণমাধ্যম তাকে প্রশ্ন করলে তিনি দায় চাপিয়ে দিয়েছেন তার বয়স ও স্বল্প প্রযুক্তিজ্ঞানের ওপর। বয়সই যদি ভুল বানানের দায়মুক্তির ছুতো হয়, তা হলে ঐ বয়সের কারণেই বলা যেতে পারে– এবার তার প্রস্থানের সময় হয়ে এসেছে। তিনি একটানা এক চেয়ারে সাত বছর বসে থাকায় চেয়ারটা যথেষ্ট ভারাক্রান্ত, ইত্যবসরে চেয়ারটার ডায়াবেটিসও হয়ে থাকতে পারে। চেয়ারটাকে এবার একটু জগিংয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে বোধ করি।

প্রকাশনী-বন্ধের তুঘলকি কাণ্ডের পর শামসুজ্জামান খানের ফেসবুক পোস্টের দিকে সবার নজর থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। অ্যাকাডেমিতে খান সাহেবের আমলা-কামলার নিশ্চয়ই অভাব নেই। প্রযুক্তিজ্ঞান কম থাকলে তিনি কোনো টাইপিস্টের সাহায্য নিতে পারতেন, অন্য কাউকে দিয়ে টাইপ করিয়ে নিজ টাইমলাইনে তা অনায়াসে কপি পেস্ট করতে পারতেন। এতে তার অন্তত চেয়ারটার মান খানিকটা বাঁচত। বানানভুলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন তার রচিত বইগুলো পড়তে। যেহেতু তিনি শত-শত বই লিখেছেন, সেহেতু তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু ছোট্ট একটি ফেসবুক পোস্ট সামলাতে গিয়ে যেভাবে তিনি বেসামাল হয়েছেন, প্রকাশনী নিষিদ্ধকরণ ইশুতে ডিজি যেভাবে টাল হয়েছেন, আট-দশবার এডিট করার পরও যেভাবে তার পোস্টে ডজনের অধিক ভুল রয়ে গেছে; তাতে দুষ্ট ছেলেদের দেওয়া 'ডিজি টাল' খেতাবটি তার সাথে নিঃসন্দেহে খাপ খেয়ে যায়।

পুনশ্চ :

একবার এক পত্রিকায় একটা খবরের শিরোনামে ছাপা হলো– 'পুলিশের গু খেয়ে বকের মৃত্যু।' ব্যাপারটা পাঠকসমাজে ভীষণ চাঞ্চল্যের জন্ম দিলো। লোকজন বলাবলি শুরু করল দেশে বকের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, তাই বকরা বাধ্য হয়ে মনুষ্যমল ভক্ষণ করছে। আরেক দল লোক বলল মরে যাওয়া বকটা যে পুলিশেরই মল খেয়েছিল, এর প্রমাণ কী; মলের গায়ে কি লেখা ছিল এই মল পুলিশের। অন্য দল সন্দেহ প্রকাশ করল এই মর্মে যে, বক চড়ে বেড়ায় নদীতে, থাকে গাছে; পুলিশ নিশ্চয়ই নদীতে গিয়ে বা গাছের মগডালে উঠে মল ত্যাগ করে না, পুলিশ অতটাও বেলাজ না; কিছু পুলিশ উপরি আয়ের জন্য বহু নিচে নামতে পারে, কিন্তু সেরেফ মলত্যাগের জন্য অত ওপরে উঠবে না।

পরেরদিন পত্রিকায় সংশোধনী এলো– 'পুলিশের গুলি খেয়ে বকের মৃত্যু।' পাঠকসমাজ এবার কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেও পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা খুব ক্ষেপে গেল; যে বন্দুক দিয়ে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা, সেই বন্দুক দিয়ে বকনিধনের দায়ে তারা পুলিশকে অভিযুক্ত করতে লাগল। ছাপার ভুল স্বীকার করে শেষতক পত্রিকাটি বলল, 'দুইদিন ধরে আমাদের পত্রিকায় অশুদ্ধ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে। শুদ্ধ শিরোনামটি হবে– পুলিশের গুলি খেয়ে যুবকের মৃত্যু। অনিচ্ছাকৃত পাছার চুলের জন্য আমরা দুঃখিত।' এর পর পাঠকসমাজ ভয়ে-আতঙ্কে ঐ পত্রিকার ভুলত্রুটি নিয়ে আর আলোচনা করেনি।

প্রথম আলোর ওরফে-প্রীতি

প্রথম আলোর খুব বাজে একটা সম্পাদকীয় নীতি হচ্ছে 'ডাকনাম' না ছাপা। এই নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পত্রিকাটি রীতিমতো ভজকট পাকিয়ে ফেলছে। তারা কারো-কারো ডাকনাম ছাপছে, কারো-কারোটা ছাপছে না। প্রথম আলো মতিউর রহমান নিজামীর নাম কখনও শুধু মতিউর রহমান লেখে না, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম কখনও শুধু দেলাওয়ার হোসাইন লেখে না, সিপিবির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে মুজাহিদুল ইসলাম বা মুজাহিদুল লেখে না, জাসদের হাসানুল হক ইনুকে হাসানুল হক বা হাসানুল লেখে না কিংবা ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেননকে লেখে না রাশেদ খান। প্রথম আলোকে কখনোই 'ফজলে হাসান' বা 'ফজলে হাসান ওরফে আবেদ' লিখতে দেখা যায়নি, বরাবরই লিখেছে ফজলে হাসান আবেদ।

কিন্তু তারা নাজমুল হাসান পাপনকে লেখে শুধু নাজমুল হাসান, পুরো প্রতিবেদনের কোথাও তারা পাপন শব্দটা লেখে না! অথচ ঐ ভদ্রলোককে এমনকি তার পরিবারের সদস্যরাও নাজমুল নামে চেনেন না, চেনেন পাপন নামেই। কোনো ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত হলে এবং তার পুরো নাম লিখতে বাধ্য হলে প্রথম আলো সেই নামের মাঝখানে 'ওরফে' ব্যবহার করে। যেমন– মাহমুদুল হাসান ওরফে রনি। যেখানে 'মাহমুদুল হাসান রনি' লেখাটাই স্বাভাবিক আচরণ, সেখানে প্রথম আলোর কেন এই ওরফেবাজি?

আবার প্রথম আলোর ঘনিষ্ঠ চিত্রপরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর নাম প্রথম আলো কখনোই শুধু 'মোস্তফা সরয়ার' লিখেছে বলে নজির নেই (অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশার নামও তারা নুসরাত ইমরোজ বা নুসরাত লেখে না, তিশাই লেখে)। কিন্তু তারা আরেক চিত্রপরিচালক মুহম্মদ মুস্তফা কামাল রাজকে লেখে মুহম্মদ মুস্তফা কামাল, চিত্রপরিচালক শাহিন কবির টুটুলকে লেখে শাহিন কবির,

প্রয়াত আবৃত্তিশিল্পী কামরুল হাসান মঞ্জুকে লিখেছে শুধু কামরুল হাসান। মঞ্জু শব্দটা লিখলে মনে হয় প্রথম আলোর জাত যেত, কারওয়ানবাজারের কালি ফুরিয়ে যেত কিংবা সিএ ভবনে ভূমিকম্প হতো।

গোটা দেশবাসী যেখানে ক্রিকেটার আমিনুল ইসলাম বুলবুল, খালেদ মাসুদ পাইলট, মিনহাজুল আবেদিন নান্নু, মেহরাব হোসেন অপিকে চেনে বুলবুল, পাইলট, নান্নু, অপি নামে; যেখানে গোটা একটা প্রজন্মের কাছে এই নামগুলো বিরাট আবেগের, প্রথম আলো সেখানে পাকনামো করে তাদের নাম লেখে যথাক্রমে আমিনুল, খালেদ, মিনহাজুল আর মেহরাব। তারা আগের প্রজন্মের এনামুল হক মণিকেও লিখত এনামুল, এই প্রজন্মের এনামুল হক বিজয়কেও লেখে এনামুল; অথচ দেশব্যাপী তারা মণি ও বিজয় নামে পরিচিত। প্রথম আলো ক্রিকেটার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতকে লেখে মোসাদ্দেক হোসেন, ভেতরে লেখে মোসাদ্দেক; কিন্তু বিএনপি-নেতা মোসাদ্দেক আলী ফালুর নাম মোসাদ্দেক আলী ফালুই লেখে, মোসাদ্দেক আলী লেখে না এবং ভেতরে তার নাম ফালুই লেখে, মোসাদ্দেক না।

আবরার-হত্যার পর প্রথম আলো পড়েছে বিপদে। এই মামলার অন্যতম দুই আসামির নাম মেহেদি হাসান রাসেল আর মেহেদি হাসান রবিন। এখন প্রথম আলো যেহেতু ডাকনাম ছাপে না এবং এখানে মেহেদি হাসান যেহেতু দুই পিস; ফলে প্রথম আলো ওদের নাম লিখছে 'ওরফে' লাগিয়ে– মেহেদি হাসান ওরফে রাসেল, মেহেদি হাসান ওরফে রবিন।

ক্যাসিনো-ব্যবসায়ী ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে প্রথম আলো লিখছে 'ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ওরফে সম্রাট' আর প্রতিবেদনের ভেতরে লিখছে সম্রাট। অপরদিকে আরেক ক্যাসিনো-ব্যবসায়ী মমিনুল হক সাঈদকে লিখছে 'মমিনুল হক ওরফে সাঈদ' আর প্রতিবেদনের ভেতরে লিখছে মমিনুল। এখানেও দুজনের ক্ষেত্রে দুই নিয়ম!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– মানুষের নাম নিয়ে প্রথম আলোর এত চাপাচাপি কিসের? কিসের এত কোষ্ঠকাঠিন্য? নাম নিয়ে প্রথম আলো এত

সিদ্ধান্তহীনতা আর বিভ্রান্তিতে ভোগে কেন? যার যা নাম, এর পুরোটা হুবহু ছাপলে প্রথম আলোর সমস্যা কী? একজনের নাম পুরোটা ছেপে আরেকজনের নাম আংশিক ছাপার হেতু কী? এইসব 'ওরফে' লাগানোরই বা কী প্রয়োজন? প্রথম আলোকে এত আলাদা হতে হবে কেন? শুনেছি ভাসুরের নাম মুখে আনা নিষিদ্ধ। তবে কি মতিউর রহমান নিজামীরা প্রথম আলোর ভাসুর? আর নাজমুল হাসান পাপনরা প্রথম আলোর দেবর? প্রথম আলো এত কাটাকাটি পছন্দ করে কেন? প্রথম আলো কী– সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, না হাজাম?

বাংলাদেশে নাম সাধারণত তিন শব্দের হয়, যেমন– মনির হোসেন মন্টু, নুসরাত জাহান মিতু, শারমিন সুলতানা নিতু। উল্লিখিত নাম তিনটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে মন্টু, মিতু আর নিতু শব্দত্রয়। মন্টু শব্দটাকে বাদ দিলে মনির হোসেনের কোনো অস্তিত্বই থাকে না, আবার মিতু বা নিতু বাদ দিয়ে কেবল নুসরাত জাহান বা শারমিন সুলতানা নামে ডাক দিলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মহল্লা থেকে শত-শত মেয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ উল্লিখিত নামত্রয় থেকে মন্টু-মিতু-নিতু বাদ দিলে ব্যক্তিত্রয়েরও অস্তিত্ব থাকে না, নামত্রয়ও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

এমন না– প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ এসব বোঝে না। তারা এসব ভালোভাবেই বোঝে। বিভিন্ন সময়ে আপত্তি ওঠা সত্ত্বেও একটু আলাদা সাজার জন্য এবং আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য প্রথম আলো এই খামেখেয়ালিটা করে থাকে, যা অত্যন্ত বিরক্তিকর ও আপত্তিকর। নাম নিয়ে এই ফাজলামো প্রথম আলোকে বন্ধ করতেই হবে। অন্যথায় কেউ-কেউ প্রথম আলোকে 'প্রথম ওরফে আলো', মতিউর রহমানকে 'মতিউর ওরফে রহমান', আনিসুল হককে 'আনিসুল ওরফে হক' ডাকা শুরু করলে তাতে আপত্তি করার বা আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

১৯ অক্টোবর ২০১৯

ছহি শব্দক্রম

বাক্যে শব্দক্রম ঠিকঠাক থাকা অত্যন্ত জরুরি। শব্দক্রম এদিক-সেদিক হলে যেমন লেখকের দুর্বলতা ও অক্ষমতা ধরা পড়ে; তেমনি গোটা বাক্যের অর্থও বদলে যায়, কখনও-কখনও হাস্যরসেরও জন্ম দেয়, ঘটে চূড়ান্ত ব্যাকরণবিপর্যয়। শুধু সংবাদপত্রগুলোই না, অনেক ডাকসাইটে লেখকও বাক্যের শব্দক্রম ঠিক রাখতে পারেন না, খেই হারিয়ে ফেলেন। আমপাঠকের নজর এড়িয়ে গেলেও সচেতন পাঠক তা নিমিষেই ধরে ফেলেন। এতে পড়ার আগ্রহই চলে যায়। সাধারণ কেউ এই ভুল করলে মেনে নেওয়া যায়, উপেক্ষা করা যায়; কিন্তু কোনো সাংবাদিক কিংবা নামজাদা কোনো লেখক এমন ভুল করলে তা এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর, ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমারও অযোগ্য।

গত ২ জুলাই 'ডেইলি স্টার' লিখেছে– 'মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন বলেছে যে, মানসম্মত সেবা দেওয়ার পরও বিটিআরসি অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন সিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।' বাক্যটি পড়ে মনে হবে 'নতুন সিম বিক্রি'কে গ্রামীণফোন অপ্রত্যাশিত মনে করছে। এই বাক্যে 'অপ্রত্যাশিত' শব্দটা এমনই এক জায়গায় বসানো হয়েছে, তাতে 'নতুন সিম বিক্রি'কেই অপ্রত্যাশিত মনে হবে। কিন্তু 'নতুন সিম বিক্রি' গ্রামীণফোনের কাছে অপ্রত্যাশিত না। গ্রামীণফোনের কাছে অপ্রত্যাশিত হলো নিষেধাজ্ঞা আরোপ। ডেইলি স্টারের লেখা উচিত ছিল– 'মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন বলেছে যে, মানসম্মত সেবা দেওয়ার পরও, নতুন সিম বিক্রিতে বিটিআরসি অপ্রত্যাশিতভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।' তা হলে বাক্যটি পুরোপুরি অর্থবহ হতো।

১ জুলাই 'প্রথম আলো' লিখেছে– 'রাতভর জঙ্গিরা গুলি করে ও কুপিয়ে রেস্তোরাঁয় আসা বিদেশী নাগরিকদেরকে হত্যা করে।' এই বাক্য পড়ে মনে হচ্ছে বিদেশী নাগরিকরা কুপিয়ে রেস্তোরাঁয়

এসেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিদেশী নাগরিকরা কোপাননি, কুপিয়েছিল জঙ্গিরা। প্রথম আলোর লেখা উচিত ছিল– 'রেস্তোরাঁয় আসা বিদেশী নাগরিকদেরকে জঙ্গিরা রাতভর গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করে।'

প্রথম আলো ৩০ জুনের আরেক খবরে লিখেছে– 'শরিয়তপুরের পুলিশ সুপার প্রথম আলোকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোলকাতা থেকে ছেড়ে আসা গ্রিন লাইনের একটি বাসে অভিযান চালানো হয়।' এই খবর পড়ে যদি কেউ মনে করে যে, ঐ বাসটাই কোলকাতা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছেড়ে এসেছে, তা হলে তাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাস গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছাড়েনি, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে অভিযান। প্রথম আলো লিখতে পারত– 'শরিয়তপুরের পুলিশ সুপার প্রথম আলোকে বলেন, কোলকাতা থেকে ছেড়ে আসা গ্রিন লাইনের একটি বাসে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।' এভাবে লিখলে বাসকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছাড়তে হতো না।

১ জুলাই চট্টগ্রামের একজন সমাজকর্মী ফেসবুকে লিখেছেন– 'চেরাগির মোড়ে আজ নড়াইল কলেজ অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসকে জুতার মালা ও সাভারে অধ্যাপক উৎপল কুমার সরকার হত্যাকাণ্ডসহ হিন্দু শিক্ষকদের ওপর নিগ্রহের প্রতিবাদে মানববন্ধন পালন করা হয়।' এই বাক্যটি পড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চেরাগির মোড় নড়াইলে অবস্থিত। কিন্তু চেরাগির মোড় অবস্থিত আসলে চট্টগ্রামে। বাক্যটি পড়ে আরো মনে হবে শিক্ষক নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে 'আজ', অর্থাৎ যেদিন মানববন্ধন করা হয়েছে, ঐদিন। তার লেখা উচিত ছিল– 'নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসকে জুতারমালা পরানো ও সাভারে অধ্যাপক উৎপল কুমার সরকারকে হত্যা-সহ হিন্দু শিক্ষকদের ওপর নিগ্রহের প্রতিবাদে চেরাগির মোড়ে আজ মানববন্ধনকর্মসূচি পালন করা হয়।'

২ জুলাই প্রথম আলো লিখেছে– 'দীর্ঘদিন পর সকাল থেকেই সূর্য তাপ ছড়ানোয় সিলেটের বিভিন্ন এলাকার বন্যাকবলিত এবং নগরের

বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকটা স্বস্তি দেখা দিয়েছে।' এই খবর পড়ে মনেই হতে পারে– সিলেটের বিভিন্ন এলাকার মানুষ বন্যাকবলিত হয়েছেন দীর্ঘদিন পর সকাল থেকে সূর্য তাপ ছড়ানোর কারণে। প্রতিবেদক লিখতে পারতেন– 'বন্যাকবলিত সিলেটের বিভিন্ন এলাকার মানুষ, দীর্ঘদিন পর সকাল থেকে সূর্য তাপ ছড়ানোয় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।' এমন করে লিখলে সূর্যের সাথে বন্যার সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতো না।

২ জুলাই ডেইলি স্টারের অন্য এক প্রতিবেদনে লেখা দেখলাম– 'পরদিন সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর আহত উৎপল মারা যান।' এই প্রতিবেদন যে-কারো মনে এই ধারণা জন্ম দিতে পারে যে, উৎপল এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই আহত হয়েছেন। অন্তত, বাক্যটির পদক্রম তা-ই বলে। কিন্তু উৎপল আসলে হাসপাতালে আহত হননি, বরং মারা গিয়েছেন হাসপাতালে। প্রতিবেদকের লেখার কথা ছিল– 'গুরুতর আহত উৎপল পরদিন এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।'

একই দিনে প্রথম আলোর আরেক খবরে দেখলাম– 'এবার ইউক্রেনকে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম দেওয়ার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।' ব্যাপারটা অত্যন্ত লোমহর্ষক। খবর পড়ে মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এমন সামরিক সরঞ্জাম দেবে (কাকে দেবে, স্পষ্ট না), যা ব্যবহার করে খোদ ইউক্রেনকেই আকাশে নিক্ষেপ করা যায়। প্রথম আলো যদি লিখত– 'ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম দেওয়ার কথা ইউক্রেনকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র', তা হলে বেচারা ইউক্রেনকে বেঘোরে আকাশে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় পড়তে হতো না। এমনকি 'ইউক্রেনকে'র পর সেরেফ একটা কমা দিলেও চলত।

কিশোরগঞ্জের একটা মসজিদের দানসিন্দুকে সম্প্রতি মোটা অঙ্কের টাকা জমা হয়েছে। এ নিয়ে 'বিডি নিউজ' ২ জুলাই লিখেছে– 'শনিবার সিন্দুক খুলে সাড়ে ষোলো বস্তায় জমা এই টাকা গোনা হয় বলে মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান।' এ কথা পড়ে

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সাড়ে ষোলো বস্তা টাকা শনিবারই জমা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই টাকা দীর্ঘদিন ধরে জমেছে, সিন্দুক খোলা হয়েছে শনিবার। বিডি নিউজ লিখতে পারত– 'সাড়ে ষোলো বস্তায় জমা টাকা শনিবার সিন্দুক খুলে গোনা হয় বলে মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান।' একই প্রতিবেদনে লেখা দেখলাম– 'সকাল নয়টায় জেলাপ্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে সিন্দুক খোলা হয়।' এই বাক্য পড়েও মনে হতে পারে ঐ কর্মকর্তাদেরকে সিন্দুক খোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সকাল নয়টায়। কিন্তু আসলে তাদেরকে দায়িত্ব আগেই দেওয়া হয়েছে। বিডি নিউজের লেখা উচিত ছিল– 'জেলাপ্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে সকাল নয়টায় সিন্দুক খোলা হয়।'

২ জুলাই ইত্তেফাক মারফত জানলাম– 'গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।' এই তথ্য পড়ে মনেই হতে পারে– ঐ ছয় ব্যক্তি মারাও গেছেন গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, করোনায়ও আক্রান্ত হয়েছিলেন গত চব্বিশ ঘণ্টারই মধ্যে। কিন্তু আসলে তারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন একেকজন একেক সময়ে। ইত্তেফাক 'করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরো ছয়জন গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন' লিখলে বাক্যটা পুরোপুরি অর্থবহ হতো।

'ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে টানাপোড়েনের ঘটনা ঘটছে কেন'– এই শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে ১ জুলাই বিবিসি বাংলা একজন শিক্ষককে উদ্ধৃত করে লিখেছে– 'কিন্তু এখন শাসন একেবারেই না থাকায় অনুশোচনা বলে যে একটি বিষয় আছে, সেটিই অনেক শিক্ষার্থী জানে না।' বাক্যটি পড়ে মনে হবে– অনুশোচনা বলে যে ব্যাপারটা আছে, শাসন না থাকায় সেটা তৈরি হয়েছে। শিক্ষক কথাটাকে এভাবে বলতে পারতেন– 'কিন্তু অনুশোচনা বলে যে একটা বিষয় আছে, এখন শাসন না থাকায় সেটিই অনেক শিক্ষার্থী জানে না।'

ভারতের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর জানিয়ে ২৯ জুন বিবিসি বাংলা লিখেছে– 'এই ঘোষণার (পদত্যাগের ঘোষণা) সঙ্গেই

শিবসেনার অভ্যন্তরে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, এর একটা অধ্যায় শেষ হলো বলে মনে হচ্ছে।' বাক্যটা পড়ে মনে হতে পারে– শিবসেনার অভ্যন্তরে সংকট তৈরি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণার কারণে। আসলে তা নয়। শিবসেনার অভ্যন্তরে সংকট তৈরি হয়েছিল আসলে অন্য কোনো কারণে, মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করায় সেই সংকট বরং কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। বিবিসি বাংলা লিখতে পারত– শিবসেনার অভ্যন্তরে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে এর একটা অধ্যায় শেষ হলো বলে মনে হচ্ছে।

ভাষাসৈনিক গাজিউল হক ১৯৮৪ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় লিখেছিলেন– '২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে বরকত যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, সেখানে গড়ে উঠল ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহিদমিনার' (তথ্যসূত্র : ব্যবহারিক বাঙলায় ভ্রমকণ্টক, লেখক রণজিৎ বিশ্বাস)। গাজিউল হক না চাইলেও এই বাক্যটির মাধ্যমে ইতিহাস বদলে গেছে। বরকত আসলে নিহত হয়েছিলেন ২৩ তারিখে না, ২১ তারিখে। কিন্তু বাক্যগঠনে গাজিউল হকের অসংগতির কারণে যেকোনো পাঠকেরই মনে হতে পারে বরকত নিহত হয়েছিলেন ২৩ তারিখে। কোনো বিভ্রান্তিই তৈরি হতো না, গাজিউল হক যদি লিখতেন– 'বরকত যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে সেখানে গড়ে উঠল ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহিদমিনার।'

সৈয়দ আবদুল হাদি সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে গুগল সার্চ করে দেখি উইকিপিডিয়া লিখে রেখেছে– '২০০০ সালে সংগীতে অবদানের জন্য তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদক লাভ করেন।' এই বাক্য পড়ে নির্ঘাত মনে হবে হাদি সংগীতে অবদান রেখেছেন ২০০০ সালে অথবা তাকে পদক দেওয়া হয়েছে শুধু ২০০০ সালে গাওয়া গানগুলোর জন্য। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে সংগীতে জীবনব্যাপী অবদানের জন্যই তাকে পদকটা দেওয়া হয়েছে। উইকিপিডিয়ার লেখা উচিত ছিল– সংগীতে অবদানের জন্য ২০০০ সালে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদক লাভ করেন।

দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার একজন বলছিলেন– 'বাইক অ্যাক্সিডেন্টে আমার তিনটি পায়ের আঙুল ভেঙে গেছে।' এহেন বর্ণনা শুনে মনেই হতে পারে হতভাগা লোকটির পায়ের সংখ্যা তিন বা ততোধিক। তিনি যদি বলতেন যে, তার 'পায়ের তিনটি আঙুল' ভেঙে গেছে, তা হলে তার পদসংখ্যা নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয়েরই উদ্রেক ঘটত না।

বন্যার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রতিবেদকরা প্রায়ই লিখে থাকেন– 'নদীর পানি ১৮ সেন্টিমিটার বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।' কথা হলো– বিপৎসীমা ১৮ সেন্টিমিটারের না। পানির উচ্চতা কত সেন্টিমিটার অতিক্রম করলে তাকে বিপৎসীমা অতিক্রম বলে; জানি না, তা জানা আমজনতার জন্য জরুরিও না। তবে প্রতিবেদকের এভাবে লেখা জরুরি– 'নদীর পানি বিপৎসীমার ১৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।' এখানে আরো জানিয়ে রাখা ভালো– বিপৎসীমা, বিপৎসংকেত, বিপৎকাল, বিপৎসংকুল বানানে 'দ' না, বরং খণ্ড-ৎ। বিপদ বানানে 'দ' হলেও সমাসবদ্ধ শব্দে দ 'ৎ' হয়ে যায়।

সাংবাদিকরা এ ধরনের বাক্য প্রায়ই লিখে থাকেন– 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঝালকাঠিতে খুন হওয়া শিশু মরিয়মের বাবা-মাকে আজ দেখতে গিয়েছেন জেলাপ্রশাসক ওমর ফারুক।' এ ধরনের বাক্যের কারণে এইসব সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর লোকজন যে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে না, এই-ই বেশি। কারণ এই বাক্য পড়লে নির্ঘাত মনে হবে– ঝালকাঠির শিশু মরিয়মকে খুন করতে প্রধানমন্ত্রীই নির্দেশ দিয়েছেন। সাংবাদিকদের উচিত এ ধরনের বাক্য এভাবে গঠন করা– 'ঝালকাঠিতে খুন হওয়া শিশু মরিয়মের বাবা-মাকে জেলাপ্রশাসক ওমর ফারুক আজ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেখতে গিয়েছেন।'

সংবাদপত্রে এমন বাক্যও দেখা যায়– 'প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় নিমতলি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা পুনর্বাসিত হয়েছেন।' এখানে প্রশ্ন জাগে, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় আসলে কী ঘটেছে– প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় নিমতলি অগ্নিকাণ্ডে লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, নাকি ক্ষতিগ্রস্ত

লোকজন পুনর্বাসিত হয়েছেন। 'নিমতলি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় পুনর্বাসিত হয়েছেন'– বাক্যটা এভাবে লিখলে আর কোনো ব্যাকরণগত প্রশ্ন জাগে না।

শুরুতেই বলেছি– আমজনতা এসব ভুল ধরার সক্ষমতা রাখে না। ফলে এসব ভুলের ব্যাপারে অনেক প্রথিতযশা লেখকও সচেতন না, সচেতন করতে চাওয়া হলেও তারা সচেতন হতে চান না, সচেতনকারীকে উলটো শত্রুজ্ঞান করেন। কিন্তু শেখার মানসিকতা থাকলে এবং খামখেয়ালি পরিহার করলে যেকোনো বয়সে যে-কারো কাছ থেকেই শিখে নিয়ে শুদ্ধভাবে লেখা সম্ভব। শেখায় কোনো অগৌরব নেই। শেখার সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না শেখাটা অগৌরবের। সচেতন পাঠক যদি একবার ধরে ফেলে যে, লেখক ব্যাকরণ জানেন না; তা হলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হবেনই।

৩ জুলাই ২০২২

আবদুর রহিমের টাকনু-নীতি ও বানানবিভ্রাট

জারিকৃত কথিত বিজ্ঞপ্তিতে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. মুহম্মদ আবদুর রহিম লিখেছিলেন– 'অত্র ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অফিস চলাকালীন সময়ে মোবাইল সাইল্যান্ড/বন্ধ রাখা এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পুরুষ টাকনুর উপরে ও মহিলা হিজাবসহ টাকনুর নীচে কাপড় পরিধান করা আবশ্যক এবং পর্দা মানিয়া চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।'

এ ব্যাপারে বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন– 'আমি একজন বিসিএস কর্মকর্তা। আমি আমার অফিস চালাব আমার স্টাইলে।' সরকারি বা বেসরকারি কোনো কর্মকর্তা তার অধীনদেরকে এ ধরনের নির্দেশ দিতে পারেন কি না, রাষ্ট্র তাকে সেই এখতিয়ার দিয়েছে কি না; সেটি এই লেখার আলোচ্য বিষয় নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রাম-ধমকের মুখে রহিম ইতোমধ্যেই লেজ গুটিয়ে জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন এবং এ জাতীয় পোদ্দারি ভবিষ্যতে না করার মুচলেকা দিয়েছেন।

আবদুর রহিমের বিজ্ঞপ্তিতে বাক্য ছিল সাকুল্যে একটি। এখানে 'সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবগতির জন্য' কথাটি ভুল। বাংলা ভাষায় পরপর দুটো বহুবচনবাচক শব্দ বসানো যাবে না। সঠিক কথাটি হবে– 'সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবগতির জন্য'। আবার 'অফিস চলাকালীন সময়ে' কথাটিও বাহুল্যদোষে দুষ্ট। শুদ্ধ হবে 'অফিস চলাকালে' অথবা 'অফিস চলার সময়ে' (যেহেতু কালও যা, সময়ও তা)। এখানকার 'মুসলিম ধর্মাবলম্বী' কথাটিও অশুদ্ধ। শুদ্ধ হবে– 'ইসলাম ধর্মাবলম্বী'। কারণ 'মুসলিম' কোনো ধর্ম নয়, ধর্ম হচ্ছে 'ইসলাম'। যারা ইসলামধর্ম অবলম্বন করেন, তারা মুসলিম। ইসলাম হচ্ছে ধর্মের নাম, মুসলিম হচ্ছে অনুসারীদের নাম। তা ছাড়া 'নীচে'

না হয়ে হবে 'নিচে'। নীচ মানে নিকৃষ্ট। আলোচ্য বাক্যটির প্রায় পুরোটাজুড়ে চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হলেও শেষদিকে সাধু ভাষার একটি ক্রিয়াপদ (মানিয়া) ব্যবহার করা হয়েছে, যা বাক্যটিকে গুরুচণ্ডালিদোষে দুষ্ট করেছে। লেখা উচিত ছিল 'মেনে'।

রহিম 'সাইলেন্ট'-কে লিখেছেন 'সাইল্যান্ড', যে ভুল 'মুরাদ টাকলা' বলে পরিচিত অশিক্ষিত লোকজনও করে না। থাইল্যান্ডের পর বিশ্ববাসী রহিমের কল্যাণে সাইল্যান্ড নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের খোঁজ পেল। বিজ্ঞপ্তিটিতে 'মহাখালী'-কে একাধিকবার 'মহাখারী' লেখা হয়েছে। মহামারির এই সংকটলগ্নে মহাখারী রহিমের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বটে। অর্থাৎ ব্যাকরণগত ভুলের এমন কোনো শাখা নেই, রহিম যে শাখায় বিচরণ করেননি। মাত্র এক বাক্যের একটি বিজ্ঞপ্তিতে এত-এত বিচিত্র, বর্ণাঢ্য, কিম্ভূতকিমাকার ভুল– সত্যি বিরল বটে। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরো অনেক ভুল আছে; যা উল্লেখ করলে লেখাটি নিছক ভারাক্রান্তই হবে, পাঠকমনে তৈরি হবে বিশ্রী বিরক্তি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– একজন 'বিসিএস কর্মকর্তা' একটিমাত্র বাক্যে এত-এত ভুল করলেন কীভাবে? এক বাক্য লিখতে এত ভুল করা ব্যক্তি 'বিসিএস কর্মকর্তা' হলেন কীভাবে? রহিম কততম বিসিএসের কর্মকর্তা? তিনি মাধ্যমিক পাশ করেছেন কত সালে? ভাষার এই বেহাল দশা নিয়ে তিনি মাধ্যমিকের গণ্ডিই বা কীভাবে পেরিয়েছেন? রহিমবর্ষে মাধ্যমিক ও বিসিএসের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল কি না, খতিয়ে দেখা হোক। রহিম যে কেবল বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, সেটি যথেষ্ট নয়; বাংলা ভাষার বারোটা বাজিয়ে দেওয়ার কারণেও তার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

২৯ অক্টোবর ২০২০

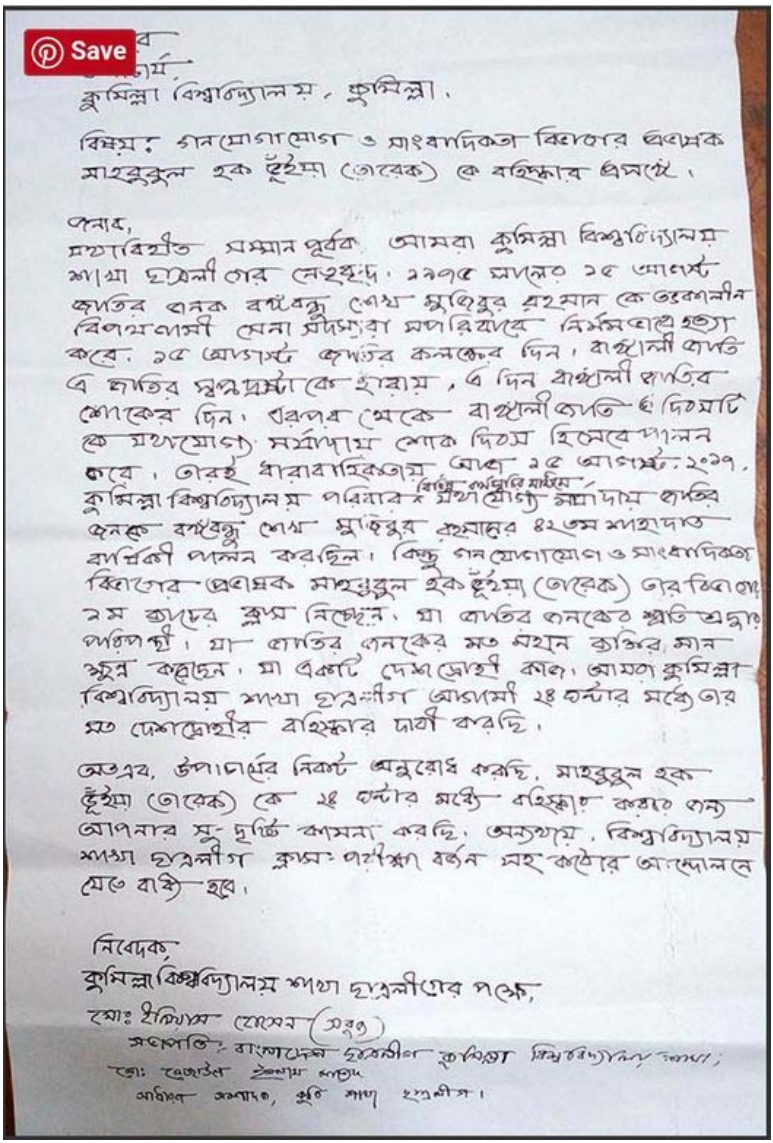

বরাবর
উপাচার্য,
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

বিষয়: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক মাহবুবুল হক ভূঁইয়া (তারেক) কে বহিষ্কার প্রসঙ্গে।

জনাব,
যথাবিহিত সম্মান পূর্বক আমরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে তৎকালীন বিপথগামী সেনা সদস্যরা সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৫ আগস্ট জাতির কলঙ্কের দিন। বাঙ্গালী জাতি এ জাতির স্বপ্নদ্রষ্টাকে হারায়, এ দিন বাঙ্গালী জাতির শোকের দিন। এরপর থেকে বাঙ্গালী জাতি এ দিবসটি কে যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক দিবস হিসেবে পালন করে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ আগস্ট ২০১৭, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করছিল। কিন্তু গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক মাহবুবুল হক ভূঁইয়া (তারেক) ঐ দিনে ১ম ব্যাচের ক্লাস নিয়েছেন। যা জাতির জনকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। যা জাতির জনকের মত মহান ব্যক্তির মান ক্ষুন্ন করেছেন। যা একটি দেশদ্রোহী কাজ। আমরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এর মত দেশদ্রোহীর বহিষ্কার দাবী করছি।

অতএব, উপাচার্যের নিকট অনুরোধ করছি, মাহবুবুল হক ভূঁইয়া (তারেক) কে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিষ্কার করার জন্য আপনার সু-দৃষ্টি কামনা করছি। অন্যথায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন সহ কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

নিবেদক,
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের পক্ষে,
মোঃ ইলিয়াস হোসেন (সবুজ)
সভাপতি- বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা;
মোঃ রেজাউল ইসলাম মাজেদ
সাধারণ সম্পাদক, কুবি শাখা ছাত্রলীগ।

বরাবর : কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ

জাতীয় শোকদিবসে কিছু ছাত্রের অনুরোধে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পড়া বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং একে রাষ্ট্রদ্রোহ হিশেবে অভিহিত করে ঐ শিক্ষককে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েছে ছাত্রলিগের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। শোকদিবসে পড়া বুঝিয়ে দেওয়াটা রাষ্ট্রদ্রোহ কি না, সেই হিশেবে না গিয়ে একটু অন্য দিকে আলোকপাত করা যাক। উপাচার্যের কাছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ যে দরখাস্তটি দাখিল করেছে, এর ভাষাগত দিকটি একটু পর্যালোচনা করা যাক।

১. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ দরখাস্তের চতুর্থ লাইনে 'গণযোগাযোগ' বানানে ভুল করেছে। তারা এখানে ণ ব্যবহার না করে ন ব্যবহার করেছে।

২. বহিষ্কার বানানে ভুল। 'বহিষ্কার' না লিখে তারা এই দরখাস্তে একাধিকবার 'বহিস্কার' লিখেছে। পুরস্কার, তিরস্কার, মিথষ্ক্রিয়া বানানে স হলেও পরিষ্কার, আবিষ্কার, বহিষ্কার বানানে ষ হয়।

৩. এককালে ঙ্গ-এর ওপর চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের প্রচলন থাকলেও এখন তা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত। ফলে 'প্রসঙ্গেঁ' না হয়ে 'প্রসঙ্গে' হবে এবং 'বঙ্গঁবন্ধু' না হয়ে 'বঙ্গবন্ধু' হবে।

৪. সপ্তম লাইনে 'যথাবিহীত' লেখা হয়েছে। শুদ্ধ বানান হবে যথাবিহিত।

৫. এই দরখাস্তের অষ্টম লাইন-সহ একাধিক লাইনে 'আগস্ট'-কে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ 'আগষ্ট' লিখেছে। ষত্ব বিধান অনুযায়ী বিদেশী শব্দে ষ হবে না।

৬. নবম লাইনে 'রহমান কে' লেখা হয়েছে, যা 'রহমানকে' লেখা উচিত ছিল; রহমান আর কে-এর মাঝে স্পেস হবে না।

৭. একাদশ লাইনে 'বাঙ্গালি'-কে লেখা হয়েছে 'বাঙ্গাঁলী'।

৮. ত্রয়োদশ লাইনে 'দিবসটি' লিখে 'কে' লেখা হয়েছে চতুর্দশ লাইনে, যা একত্রে 'দিবসটিকে' লেখা উচিত ছিল।

৯. দ্বাবিংশ লাইনে লিখিত 'ক্ষুন্ন' শব্দটি ভুল, এটি 'ক্ষুণ্ন' হবে।

১০. ণত্ব বিধান অনুযায়ী 'ঘণ্টা' বানানে ণ হবে, যা তারা 'ঘন্টা' লিখেছে।

১১. বিদেশী শব্দে ঈ-কার না হওয়ায় এবং শব্দটি আরবি হওয়ায় 'দাবি' বানানে ই-কার হবে, যেখানে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ লিখেছে 'দাবী'।

১২. দরখাস্তের শেষ দিকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ লিখেছে 'অতএব, উপাচার্যের নিকট অনুরোধ করছি, মাহবুবুল হক ভূঁইয়া (তারেক) কে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কার করার জন্য আপনার সু-দৃষ্টি কামনা করছি।' বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল– 'অতএব, উপাচার্যের নিকট অনুরোধ করছি মাহবুবুল হক ভুঁইয়া (তারেক)-কে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কার করার জন্য' অথবা 'অতএব, মাহবুবুল হক ভুঁইয়া (তারেক)-কে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কার করার জন্য আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি।' একই বাক্যে 'অনুরোধ করছি' এবং 'সুদৃষ্টি কামনা'র কোনো দরকার ছিল না।

১৩. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ দরখাস্তের শুরুর দিকে লিখেছে– 'যথাবিহীত সম্মানপূর্বক আমরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।' বাক্যটি অসম্পূর্ণ, বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল– 'যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।' তারা যথাবিহিত সম্মানটা উপাচার্যকে না দিয়ে ভুল করে নিজেদেরকেই দিয়ে বসেছে।

ছাত্রলিগ ছাত্রদের সংগঠন, লেখাপড়াই যাদের প্রধান কাজ। লেখাপড়া যাদের প্রধান কাজ, প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে; তাদের অন্তত একটা দরখাস্ত শুদ্ধভাবে লিখতে পারার কথা। ছাত্রলিগ নিশ্চয়ই মেধাবীদের সংগঠন এবং এর একটা ইউনিটের সভাপতি-সম্পাদক নিশ্চয়ই ঐ

ইউনিটের অন্য নেতা-কর্মীদের চেয়ে বেশি মেধাবী। একটা দরখাস্ত লিখতে তাদের এত ভুল হওয়ার কথা না। অথচ এক পৃষ্ঠার একটা দরখাস্তের ভেতরে-বাহিরে অন্তরে-অন্তরে যত ধরনের ভুল হওয়া সম্ভব, আলোচ্য দরখাস্তটিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিগ তত ধরনের ভুলই করেছে।

শোকদিবসে পড়া-বুঝিয়ে-দেওয়া শিক্ষককে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে ভুল বাক্যে ভুল বানানে তার 'বহিস্কার' দাবি করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শুদ্ধ বানানে একটা দরখাস্ত লিখতে শেখা, মাতৃভাষাকে সম্মান করতে শেখা। এই দরখাস্তটা বাংলাদেশ রিকশা-ভ্যান শ্রমিক লিগের লিখিত হলে বানান বা ভাষা নিয়ে এত কথা বলার দরকার পড়ত না, সংগঠনটি ছাত্রদের বলেই এত কথার অবতারণা। তাই, শুদ্ধ বানানে দরখাস্ত লেখা শেখার জন্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলিগকে বিনীত পরামর্শ দিচ্ছি।

১৭ আগস্ট ২০১৭

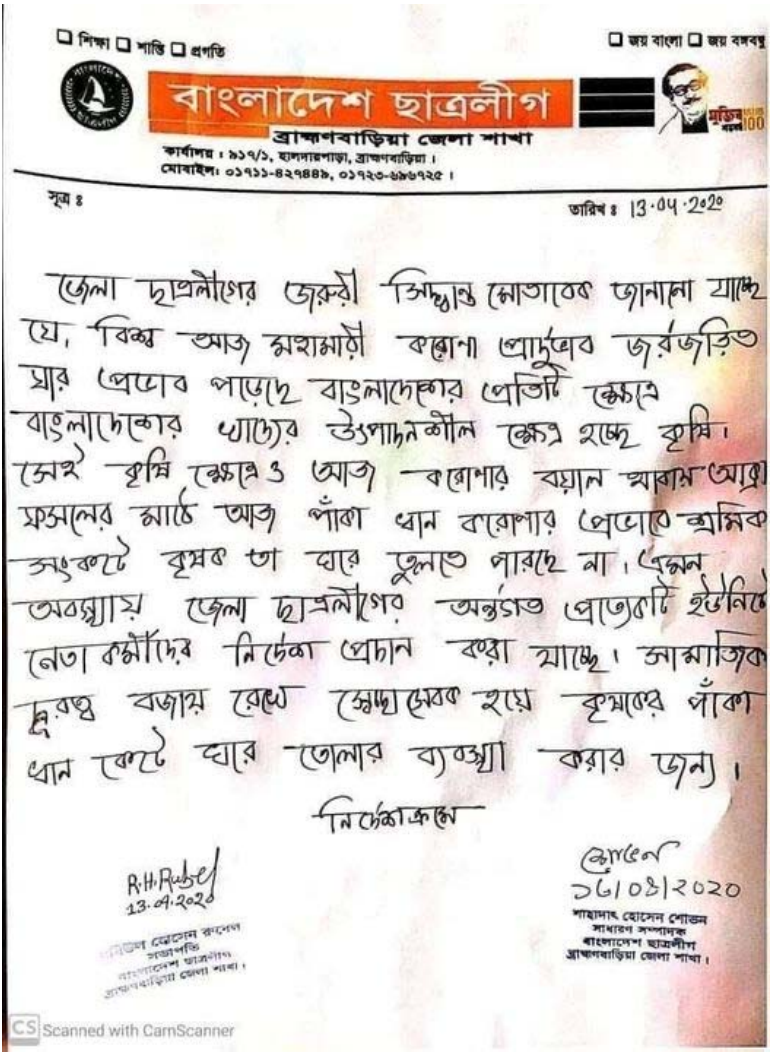

☐ শিক্ষা ☐ শান্তি ☐ প্রগতি ☐ জয় বাংলা ☐ জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা

কার্যালয় : ৯১৭/১, হালদারপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মোবাইল: ০১৭১১-৪২৭৪৪৯, ০১৭২৩-৬৯৬৭২৫।

সূত্র :

তারিখ : 13.04.2020

জেলা ছাত্রলীগের জরুরী সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্ব আজ মহামারী করোনা প্রাদুর্ভাব জর্জরিত যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খাদ্যের উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি। সেই কৃষি ক্ষেত্রেও আজ করোনার ভয়াল থাবায় আক্রা ফসলের মাঠে আজ পাঁকা ধান করোনার প্রভাবে শ্রমিক সংকটে কৃষক তা ঘরে তুলতে পারছে না। এমন অবস্থায় জেলা ছাত্রলীগের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ইউনিটে নেতা কর্মীদের নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কৃষকের পাঁকা ধান কেটে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করার জন্য।

নির্দেশক্রমে

R.H.Rubel
13.04.2020
…ল হোসেন রুবেল
সভাপতি
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা।

শোভন
১৩।০৪।2020
শাহাদাৎ হোসেন শোভন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা।

CS Scanned with CamScanner

বরাবর : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্রলিগ

১) জরুরী না, জরুরি। জরুরি আরবি শব্দ। বিদেশী শব্দে ঈ-কার হবে না।
২) মহামারী না, মহামারি।
৩) করোণা না, করোনা। বিদেশী শব্দে ণ হবে না।
৪) জর্রজড়িত না, জর্জরিত।
৫) 'বাংলাদেশের খাদ্যের উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি'– এই বাক্যটা কোনো অর্থ তৈরি করে না। শব্দগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পুনর্বিন্যাস করলেও বা সংযোজন-বিয়োজন ঘটালেও বাক্যটা নিরর্থকই থেকে যায়।

৬) থাবা বয়াল হয় না, থাবা ভয়াল হয়।
৭) বাক্যটা 'সেই কৃষি ক্ষেত্রেও আজ করোণার বয়াল থাবায় আক্রান্ত' হবে না, হবে– 'সেই কৃষিক্ষেত্রও আজ করোনার ভয়াল থাবায় আক্রান্ত।'
৮) ধান পাঁকা হয় না, পাকা হয়।
৯) বাক্যটা 'ফসলের মাঠে আজ পাঁকা ধান করোণার প্রভাবে শ্রমিক সংকটে কৃষক তা ঘরে তুলতে পারছে না' হবে না, হবে– 'ফসলের মাঠ থেকে পাকা ধান কৃষক করোনার প্রভাবে আজ শ্রমিকসংকটের কারণে ঘরে তুলতে পারছে না।'

সিকি পৃষ্ঠার এই বিজ্ঞপ্তিটিতে বাক্য আছে সাকুল্যে পাঁচটি। পাঁচটি বাক্যে এই ভুলগুলো ছাড়াও আরো বহু ভুল আছে; যা লিখে বোঝানো যাবে না, বলে বোঝাতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরো গোটা দশ-পনেরো বাক্য থাকলে বা বিজ্ঞপ্তিটি সিকি পৃষ্ঠার না হয়ে দেড়-দুই পৃষ্ঠার হলে কী যে লোমহর্ষক এক বিপর্যয় ঘটে যেত; ভাবতেই গা শিউরে ওঠে, পায়ে ধরে ঝিঁঝি, বুকে বেঁধে ট্যাটা।

বিজ্ঞপ্তিটি একটি ছাত্রসংগঠনের। কোনো ছাত্রসংগঠনের প্রধান কাজ লেখাপড়া। কৃষকের ধান কেটে দেওয়া অবশ্যই মহতী উদ্যোগ। সেইসাথে লেখাপড়াটাও একটু মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি

এমন কাউকে দিয়ে লেখাতে হবে– যার ন্যূনতম ভাষাজ্ঞান আছে, যে অন্তত বানান করে-করে হলেও মোটামুটি শুদ্ধ বাংলায় একটা চিঠি লিখতে পারে। দেখে মনে হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিটি পঞ্চম-শ্রেণি-পাশ এমন এক বালিকাবধূকে দিয়ে লেখানো, যে কি না তিনদিন খেটেখুটে প্রবাসী স্বামীর কাছে চিঠি লেখে, চিঠি লেখার সময়ে যার ট্রানজিস্টরে বাজে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের গান– চিঠি লিখেছে বউ আমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হাতে, লণ্ঠন জ্বালাইয়া-নিভাইয়া চমকে-চমকে রাতে, চিঠি লিখেছে বউ আমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হাতে।

রাজনীতি, ধানকাটা ও মামলা-মোকদ্দমার পাশাপাশি অল্পবিস্তর লেখাপড়া করাটাও ছাত্রসংগঠনগুলোর জন্য একটু জরুরি। দেশের বৃহত্তম ছাত্রসংগঠনের একটি জেলা ইউনিটের সভাপতি-সেক্রেটারির এমন শিক্ষাগত দৈন্য একেবারেই প্রত্যাশিত না। চিঠিটি নতুন করে লিখে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে পরামর্শ দিচ্ছি, সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিচ্ছি ঐ ইউনিটে সীতানাথ বসাকের দুই কপি 'আদর্শলিপি' প্রেরণ করার জন্য।

২১ এপ্রিল ২০২০

১.

রিপ্লে (replay) মানে কোনো রেকর্ড পুনর্বার বাজানো। ক্রিকেটে 'রিপ্লে' শব্দটা বহুলপ্রচলিত এবং এই 'রিপ্লে' ছাড়া আধুনিক ক্রিকেট একেবারেই অচল। পূর্ববর্তী কোনো দৃশ্য আবার দেখানো হলে সেটাকে 'রিপ্লে' বলা হয়।

উচ্চশিক্ষিত অনেককেই লিখতে দেখা যায় 'মেসেজের রিপ্লে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ' কিংবা 'কমেন্টের রিপ্লে দেবেন দয়া করে'। এখানে 'রিপ্লে' বলতে তারা প্রত্যুত্তর বা জবাব বুঝিয়ে থাকেন! অথচ প্রত্যুত্তরের ইংরেজি রিপ্লে না, রিপ্লাই (reply)।

অতএব এখন থেকে আর মেসেজের বা কমেন্টের রিপ্লে চাওয়া যাবে না, চাইতে হবে রিপ্লাই। রিপ্লে চাইতে হবে থার্ড আম্পায়ারের কাছে।

২.

সরণ মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব। সরণ থেকে সরণি।
সরণি মানে রাস্তা, যেমন : বিজয় সরণি, প্রগতি সরণি, রোকেয়া সরণি ইত্যাদি।
এই 'সরণি' শব্দের সাথে কাউকে স্মরণ-টরন করার কোনো সম্পর্ক নেই।

৩.

ভুল : পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়!
শুদ্ধ : পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!

৪.

ভুল : পইপই করে হিশাব রাখতে হবে।
শুদ্ধ : পাই-পাই করে হিশাব রাখতে হবে।
ভুল : আমি তাকে তখন পাই-পাই করে বলেছিলাম।
শুদ্ধ : আমি তাকে তখন পইপই করে বলেছিলাম।

(বলতে হয় বা অনুরোধ করতে হয় পইপই করে, হিশাব রাখতে হয় পাই-পাই করে।)

৫.

ভুল : মুজিব কোর্ট
শুদ্ধ : মুজিব কোট

কোর্ট মানে আদালত। আর গায়ে যেটা পরা হয়, সেটা কোট।

৬.

ভুল : স্বাধীনতাত্তোর/স্বাধীনোত্তর
শুদ্ধ : স্বাধীনতা-উত্তর

৭.

১. সত্ত্বেও (তথাপি) : জ্বর সত্ত্বেও সে পরীক্ষা দেবে।
২. সত্তা (অস্তিত্ব) : আমাদের সংবিধান আমাদের জাতিসত্তার প্রতীক।
৩. স্বত্ব (মালিকানা) : বইটির স্বত্ব নিয়ে বিবাদ চলছে, বিবাদ শেষে বোঝা যাবে কে বইটির স্বত্বাধিকারী।
৪. সত্য (সঠিক) : সত্যের জয় অবধারিত।

৮.

খাঁ বানানে চন্দ্রবিন্দু আছে, খান বানানে নেই।
খাঁ বা খান লিখতে হবে, খাঁন লেখা যাবে না।
চাঁদ বানানে চন্দ্রবিন্দু আছে, চান বানানে নেই।
চাঁদ বা চান লিখতে হবে, চাঁন লেখা যাবে না।

৯.

মন্ত্রী বানানে ঈ-কার।
কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিবর্গ বানানে ই-কার।

১০.

ব্রেকফাস্ট মানেই সকালের নাশতা, লাঞ্চ মানেই দুপুরের খাবার, ডিনার মানেই রাতের খাবার।

'সে আমাকে সকালের ব্রেকফাস্ট করিয়েছে' না বলে বলতে হবে 'সে আমাকে ব্রেকফাস্ট করিয়েছে'।

'দুপুরের লাঞ্চটা আমার সাথে কোরো' না বলে বলতে হবে 'লাঞ্চটা আমার সাথে কোরো'।

'আপনি রাতের ডিনারে কী কী খাবেন' না বলে বলতে হবে 'আপনি ডিনারে কী কী খাবেন'।

১১.

ভুল : অন্যান্য নেতারা
শুদ্ধ : অন্যান্য নেতা/ অন্য নেতারা
ব্যাখ্যা– 'অন্যান্য' নিজেই বহুবচন (অন্য+অন্য)। বাংলা বাক্যে পরপর একাধিক বহুবচন বসে না।

১২.
ভুল : তার মতো সজ্জন ব্যক্তি আর দেখিনি।
শুদ্ধ : তার মতো সজ্জন আর দেখিনি।

'সজ্জন' লিখলে এর পরে আর ব্যক্তি/মানুষ/লোক লেখার দরকার নেই।

১৩.
ভুল : সান্ধ্যকালীন ব্যাংক
শুদ্ধ : সান্ধ্য ব্যাংক/ সন্ধ্যাকালীন ব্যাংক
ভুল : নৈশকালীন কোর্স
শুদ্ধ : নৈশ কোর্স/ নিশিকালীন কোর্স

সান্ধ্য মানেই সন্ধ্যাকালীন, নৈশ মানেই নিশিকালীন। সান্ধ্য ও নৈশ-এর সাথে 'কালীন' যোগ করলে তা বাহুল্যদোষে দুষ্ট হয়।

১৪.
'অন্তরের অন্তঃস্থল' বলে কিছু নেই।
জায়গাটার নাম 'অন্তরের অন্তস্তল'।

১৫.
ভুল : প্রবেশ নিষেধ/ এখানে প্রস্রাব করা নিষেধ।
শুদ্ধ : প্রবেশ নিষিদ্ধ/ এখানে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।

১৬.
ভুঁড়ি = স্ফীত উদর
ভূরি ভূরি = অনেক
১. এ জগতে, হায়, সে-ই বেশি চায়; আছে যার ভূরি ভুরি।
২. ভূরিভোজ মানে ভুঁড়িভোজ না, ভূরিভোজ মানে প্রচুর খাওয়া।

১৭.
ভুল : দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে।
শুদ্ধ : দ্রব্যমূল্য বেড়েছে/ দ্রব্যের দাম বেড়েছে।

১৮.
'মেঝে' বানানে ঝ আর 'মেজো' বানানে জ।
উদাহরণ : মেজো চাচি মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছেন।

১৯.
বেরিয়ে যাওয়া = বের হয়ে যাওয়া (লজ্জা থাকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও)
বেড়িয়ে যাওয়া = ভ্রমণ করে যাওয়া (ইদের ছুটিতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাও)

২০.
জৈনিক, জৈনক, জৈনেক না।
শব্দটা জনৈক।
উচ্চারণ– জনৈকো

২১.
উদ্দেশ্য = লক্ষ্য
উদ্দেশ = অভিমুখ/দিক/প্রতি

উদাহরণ : সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন। সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আজ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

২৩.

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ইত্যাদি হচ্ছে ক্রমবাচক শব্দ। ক্রমবাচক শব্দের সাথে 'তম' যোগ করা যাবে না।

ভুল : সে পরীক্ষায় দশমতম হয়েছে।
শুদ্ধ : সে পরীক্ষায় দশম হয়েছে।
ভুল : একাদশতম বার রক্ত দিলাম।
শুদ্ধ : একাদশবার রক্ত দিলাম।
ভুল : তার দ্বিতীয়তম স্ত্রী মারা গেছেন।
শুদ্ধ : তার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেছেন।
ভুল : এটি তার বইয়ের দ্বাদশতম সংস্করণ।
শুদ্ধ : এটি তার বইয়ের দ্বাদশ সংস্করণ।

২৪.

'গং' শব্দটি এসেছে আরবি 'গয়রহ' থেকে, যার অর্থ দল। গং শব্দটি এমনিতেই বহুবচন, এর সাথে আবার 'রা' যোগ করার দরকার নেই। অতএব 'ওসমান গংরা এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে' না লিখে 'ওসমান গং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে' লিখতে হবে।

২৫.

বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, পেশাজীবী ইত্যাদি বানানে 'বী'।
কেবল 'জীবিকা' বানানে 'বি'।

২৬.

পুরস্কার, তিরস্কার, নমস্কার, সংস্কার, মিথস্ক্রিয়া, বয়স্ক ইত্যাদি বানানে দন্ত্য স।
পরিষ্কার, আবিষ্কার, বহিষ্কার ইত্যাদি বানানে মূর্ধন্য ষ।

২৭.

সংগ্রহীত, উল্লেখিত, উপরোক্ত বলে কোনো শব্দ নেই।
শব্দ তিনটি যথাক্রমে সংগৃহীত, উল্লিখিত ও উপরিউক্ত।
উপরিউক্ত-কে উপর্যুক্তও লেখা যাবে।

২৮.

গালের দাড়ি বাদে অন্য সব দাঁড়িতে চন্দ্রবিন্দু আছে।
যিনি নৌকার দাঁড় টানেন, সেই দাঁড়িতে চন্দ্রবিন্দু আছে;
আছে দাঁড়ি-কমার দাঁড়িতেও।
নেই কেবল গালের দাড়িতে।

২৯.

'বাঁচা' বানানে চন্দ্রবিন্দু আছে, 'বেচা' বানানে নেই।
উদাহরণ :
ফসল বেচে কৃষকেরা বেঁচে থাকেন।
না খেয়ে বাঁচব, তবু সম্ভ্রম বেচব না।

৩০.

'বিপদগামী' না, শব্দটা 'বিপথগামী'।
উদাহরণ– সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে।

৩১.

ট্রাইব্রেকার বা ট্রাইবেকার না, শব্দটা হচ্ছে টাই-ব্রেকার।

৩২.

'দরিদ্র' বিশেষণটির বিশেষ্য হচ্ছে 'দরিদ্রতা' অথবা 'দারিদ্র্য'।
দারিদ্র, দারিদ্রতা কিংবা দারিদ্র্যতা বলে কোনো শব্দ নেই।

৩৩.

ধরন বানানে ন, ধারণা বানানে ণ।
দরুন বানানে ন, দারুণ বানানে ণ।

৩৪.

'জবাবদিহিতা' বলে কোনো শব্দ নেই, শব্দটা 'জবাবদিহি'।
যেমন–
লেখক কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
বাংলাদেশের কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই।
সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে সর্বস্তরে জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৫.

স্বীকার = সম্মতিদান
শিকার = অস্ত্রাদির সাহায্যে বনের পশুপাখির প্রাণবধ
উদাহরণ :
সে দোষ স্বীকার করেছে।
রাজা বাঘশিকারে গেছেন।
সে ষড়যন্ত্রের শিকার।

৩৬.

'স্ট্যান্ডবাজি' বলে কোনো শব্দ নেই।
শব্দটা 'স্টান্টবাজি'।

৩৭.

'চুল ছেড়া বিশ্লেষণ' না।
'চুলচেরা বিশ্লেষণ'।

৩৮.

একটি বাক্যে 'সংখ্যা' শব্দটি থাকলে আর একক (টি/টা/খানা/খানি/জন) উল্লেখ করার দরকার নেই।
'আমার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দশটি' না লিখে লিখতে হবে 'আমার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দশ'।
'এই পরিবারের সদস্যসংখ্যা পাঁচজন' না লিখে লিখতে হবে 'এই পরিবারের সদস্যসংখ্যা পাঁচ'।

৩৯.

'কাঁচা' বানানে চন্দ্রবিন্দু আছে, 'কাচ' বানানে চন্দ্রবিন্দু নেই।
উদাহরণ : কাচের বয়ামে কাঁচা আমের আচার রেখেছি।

৪০.

ভুল : সে আশায় গুড়েবালি।
শুদ্ধ : সে-আশার গুড়ে বালি।

৪১.

গাঁথা = নির্মাণ করা, স্থায়ী হওয়া, গ্রন্থিত করা
যেমন– মালা গাঁথা, সুতো গাঁথা, মনে গেঁথে থাকা
গাথা = কবিতা, গান
যেমন– বিজয়গাথা, শোকগাথা
বীর বাঙালি জাগল আবার জয় বাংলার প্রেমে,
বিজয়গাথা রইল গাঁথা শাহবাগের ফ্রেমে।

৪২.

ঝড় = ঝঞ্ঝা

ঝরা = পতিত হওয়া

উদাহরণ : ঝড় উঠেছে। ঝড়ে গাছপালা থেকে পাতা ঝরে পড়ছে, আকাশ থেকেও ঝরছে বৃষ্টির অবিরল ধারা।

৪৩.

'মাহ্' অর্থ 'মাস', 'মাহে রমজান' হচ্ছে 'রমজান মাস'। 'রমজান' নিজেই একটি মাসের নাম। একে 'রোজার মাস'-ও বলা যেতে পারে। তবে 'রমজানের মাস' কিংবা 'মাহে রমজানের মাস' কথাগুলো বাহুল্যদোষে দুষ্ট।

৪৪.

মুমূর্ষু, মুহূর্ত, শুশ্রূষা, দুরূহ– এই শব্দগুলোয় প্রথমে হ্রস্ব উ-কার, পরেরটায় দীর্ঘ ঊ-কার।

৪৫.

হার = পরাজয়

হাড় = হাড্ডি

হাঁড়ি = হাঁড়িপাতিল

৪৬.

ধূম = ধোঁয়া

ধুম = প্রাণচাঞ্চল্য

উদাহরণ : ধূমায়মান চায়ের কাপে খোশগল্পের ধুম পড়েছে।

৪৭.

কালি– কলমের কালি
কালী– মা কালীর দিব্যি

৪৮.

বেশি = অধিক
-বেশী = বেশধারণকারী (ছদ্মবেশী, ভদ্রবেশী)

৪৯.

স্মরণ = মনে করা (স্মরণীয়)
সরণ = দূরত্ব (রোকেয়া সরণি)
শরণ = আশ্রয় (শরণার্থী)

৫০.

জোড় = জোড়া
জোর = শক্তি
উদাহরণ–
জোরে-জোরে পড়ো।
জোরসে বলো, হেঁইয়ো!
জোর করে ভালোবাসা হয় না।
জোর যার, মুল্লুক তার।
জোরাজুরি কোরো না।

ভাঙা কাচ জোড়া লাগে না।
জোড়পুকুরে দাঁড়িয়ে সে করজোড়ে ক্ষমা চাইল।

৫১.
প্রীত = খুশি
পীড়িত = যাকে পীড়ন করা হয়েছে

৫২.
বরন = বর্ণ
বরণ = গ্রহণ করা

উদাহরণ : হলুদবরন বউটিকে সবাই বরণ করে নিলেন।

৫৩.
-বাদী = মতবাদ ধারণকারী (মৌলবাদী, সাম্যবাদী)
বাদি = মামলার ফরিয়াদি
বাঁদি = গোলাম

৫৪.

নিচ = নিম্ন
নীচ = জঘন্য
উদাহরণ : এই বাড়ির নিচতলার ভাড়াটিয়া অত্যন্ত নীচ স্বভাবের।

৫৫.

জবাবদিহি, দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ, সখ্য, দৈন্য, ঐক্য–
এই শব্দগুলোর শেষে 'তা' বসানোর প্রয়োজন নেই।

৫৬.

স্ব মানে নিজের। স্বার্থ (স্ব+অর্থ) মানে নিজের অর্থ বা নিজের মঙ্গল।
সু মানে ভালো। সার্থক (সু+অর্থক) মানে যার ভালো অর্থ আছে বা যা সফল।
এ কারণে স্বার্থ বানানে স-এর নিচে ব আছে, সার্থক বানানে নেই।

স্বার্থ– স্বার্থের পেছনে ছুটো না।
সার্থক– আমার জীবন আজ সার্থক।

৫৭.

ভুল : বাংলা ভাষাভাষী, ইংরেজি ভাষাভাষী
শুদ্ধ : বাংলাভাষী, ইংরেজিভাষী

৫৮.
কেন = কী কারণে
কেনো = ক্রয় করো
উদাহরণ : তুমি এত দাম দিয়ে কেন এসব ছাইপাঁশ কেনো?

৫৯.
মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, চিহ্ন ইত্যাদি বানানে 'দন্ত্য ন'।
এই 'ন' হ-এর কাঁধের ওপর বসবে।
অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ ইত্যাদি বানানে 'মূর্ধন্য ণ'।
এই 'ণ' হ-এর নিচে বসবে।

৬০.
শ্রী লঙ্কা
পাপুয়া নিউ গিনি
নিউ ইয়র্ক
নিউ জিল্যান্ড
নিউ সাউথ ওয়েলস
নিউ মার্কেট
নিউ টাউন
কুয়ালা লামপুর
নম পেন
বুদা পেস্ট
লা পাজ
নটর ডেম
মোনা লিসা
শাহ রুখ খান

এসব লিখতে স্পেস দিতে হবে। কারণ নামগুলোর ইংরেজি বানান লক্ষ করলেই দেখা যাবে শব্দগুলো আলাদা-আলাদা।

৬১.

মন্ত্রী; কিন্তু মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিবর্গ, মন্ত্রিপরিষদ।
প্রাণী; কিন্তু প্রাণিকূল, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিজগৎ।

৬২.

ছাড়– ইদ উপলক্ষে ২০% ছাড় চলছে।
ছার– তুই কোন ছার!

৬৩.

সূত্র : একটি শব্দ একাধিকবার বিকৃত হবে না।

উদাহরণ : আরবি 'ইলাকাহ্' থেকে বিকৃত হয়ে 'এলাকা' হয়েছে, এটি দ্বিতীয়বার বিকৃত হয়ে 'অ্যালাকা' উচ্চারিত হবে না। 'লিখা' থেকে 'লেখা' হয়েছে, এটি আর 'ল্যাখা' উচ্চারিত হবে না। কিতাব বিকৃত হয়ে কেতাব হয়েছে, কেতাবকে ক্যাতাব উচ্চারণ করা যাবে না।

৬৪.

ব্যবচ্ছেদ, শবচ্ছেদ।
কিন্তু শিরশ্ছেদ।
শিরশ্ছেদ বানানে শ্+ছ।

৬৫.

আহরণ = মধু আহরণ
আরোহণ = পর্বত আরোহণ

৬৬.

বানানগুলোর ভিন্নতা লক্ষণীয়–

পূজা > পুজো
মূলা > মুলো
ধূলা > ধুলো/ধুলি
সন্ধ্যা > সন্ধে

৬৭.

প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী, উপযোগী, উপকারী বানানে ঈ-কার।
প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা, উপযোগিতা, উপকারিতা বানানে ই-কার।

৬৮.
'এ্যা' বলে কিছু নেই, 'অ'-এর বিবৃত উচ্চারণ 'অ্যা' দিয়ে লিখতে হবে।
এ্যান্ড, এ্যাডভোকেট, এ্যালকোহল ইত্যাদি না লিখে
অ্যান্ড, অ্যাডভোকেট, অ্যালকোহল ইত্যাদি লিখতে হবে।

৬৯.
বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, ন্যূনতম, ব্যূহ–
এসব শব্দে য-ফলার ব্যবহার লক্ষণীয়।

৭০.
দীপ = বাতি
দ্বীপ = চর
দ্বিপ = হাতি

৭১.

নটর ডেম কলেজের 'নটর' ও 'ডেম' আলাদা আলাদা শব্দ,
মাঝখানে ফাঁকা থাকবে।
'নটর' ও 'ডেম' শব্দদ্বয় ফরাসি ভাষার, অর্থ আমাদের মা।
এখানে 'মা' বলতে যিশুখ্রিষ্টের মা মেরিকে বোঝানো হয়েছে।

৭২.

শঙ্কর = নামবিশেষ (পণ্ডিত রবিশঙ্কর)
সঙ্কর = দোআঁশলা (সঙ্কর জাতের গরু)

৭৩.

স্বাদ = taste
সাধ = ইচ্ছা

উদাহরণ : মাতৃভাণ্ডারের রসমালাইয়ের স্বাদ নেওয়ার সাধ জেগেছে।

৭৪.

অনূদিত = অনুবাদকৃত
অনুদিত = যা উদিত হয়নি

৭৫.

এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটিতে ঈ-কার–
আমলকী, হরীতকী, ভাগীরথী

৭৬.
সাক্ষী = যিনি সাক্ষ্য দেন
সাক্ষ্য = সাক্ষী যা বলেন

উদাহরণ : সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্যে আসামির শাস্তি হয়েছিল।

সাক্ষর = যিনি সই দিতে পারেন
স্বাক্ষর = সই

উদাহরণ : সাক্ষরদের স্বাক্ষর আর নিরক্ষরদের টিপসই আনো।

৭৭.
কতিপয় লেখকের নামের শুদ্ধ বানান–

শামসুর রাহমান
হুমায়ুন আজাদ
হুমায়ূন আহমেদ
মীর মশাররফ হোসেন
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শহীদুল্লা কায়সার
জীবনানন্দ দাশ

৭৮.
অঙ্ক, পঙ্‌ক্তি, অপাঙ্‌ক্তেয়, শৃঙ্খলা, আকাঙ্ক্ষা– এই শব্দগুলোর যুক্তবর্ণগুলো ভালোভাবে লক্ষ করতে হবে।

অঙ্কে ঙ্ক, পঙ্‌ক্তিতে ঙ্‌ক্ত, শৃঙ্খলায় ঙ্খ, আকাঙ্ক্ষায় ঙ্ক্ষ। লক্ষ্মী, যক্ষ্মা, লক্ষ্মণ (রামের ভাই) বানানে ক্ষ-এর নিচে একটা ম-ও আছে।

ভূত, উদ্ভূত, বহির্ভূত, অভূতপূর্ব ইত্যাদি সমস্ত ভূতে দীর্ঘ ঊ-কার; কেবল অদ্ভুত বানানে হ্রস্ব উ-কার।

৭৯.
ফোটা– বাগানে ফুল ফুটেছে।

ফোঁটা– লিখে রেখো একফোঁটা দিলেম শিশির।

৮০.
লক্ষ্য = উদ্দেশ্য
লক্ষ = দৃষ্টি/মনোযোগ
জীবনের লক্ষ্য যাতে বাস্তবায়িত হয়, সেদিকে লক্ষ রেখো।
সেদিন আপনাকে আমি লক্ষ করিনি।
আমার দিকে লক্ষ করো। লক্ষ করে শুনুন।

৮১.

যেসব শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করা যায়, সেসব শব্দে ং এবং যেসব শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করা যায় না, সেসব শব্দে ঙ বসবে।

সংক্রান্ত, সংকলন, সংকীর্তন; সংখ্যা; সংগীত, সংগঠন, সংগ্রহ; সংঘাত, সংঘটন, সংঘর্ষ– সন্ধিবিচ্ছেদ করা যায় বিধায় এইসব শব্দে ং বসেছে।

সঙ্কট, অঙ্ক, পঙ্কজ; শৃঙ্খলা, শঙ্খ, কাঙ্ক্ষিত; অঙ্গ, সঙ্গী, মঙ্গল; সঙ্ঘ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লঙ্ঘন– সন্ধিবিচ্ছেদ করা যায় না বিধায় এই শব্দগুলোয় ঙ বসেছে।

৮২.

ভুল : ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে।
শুদ্ধ : ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে।

'পরস্পরকে' মানেই 'একে অপরকে'। পরপর দুইবার 'পরস্পর' ব্যবহার করা যাবে না।